কাজী আনোয়ার হোসেন

বিদেশী গুপ্তচর-১

মাসুদ রানা





মাসুদ রানা

বিদেশী গুপ্তচর-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশঃ মে, ১৯৭৪

এক

চৌরঙ্গীর কন্টিনেন্টাল হোটেল।

বিদায়ের আগে এক কাপ কফি খাচ্ছে রানা লাউঞ্জে বসে। কফিটা এরা বানায় ভাল। সুটকেস গোছানোর ভার গিলটি মিঞার ওপর ছেড়ে দিয়ে নেমে এসেছে ও চার তলার স্যুইট থেকে। ট্যাক্সির জন্যে বলা হয়েছে পোর্টারকে, এতক্ষণে এসে গেছে হয়তো। যাত্রার সব আয়োজন শেষ। ভিয়েনায় চলেছে ও ইন্টারপোলের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে।

কফির কাপে তৃতীয় চুমুক দিয়েই কান খাড়া হয়ে গেল রানার।

'আচ্ছা এই হোটেলে মাসুদ রানা বলে কেউ উঠেছেন কি?' কণ্ঠস্বরটা কাঁপা কাঁপা।

চট করে চোখ তুলল রানা। এক বৃদ্ধা। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম হবে না। সম্ভ্রান্ত চেহারা। বেশিরভাগ চুলই পাকা। হাতের চামড়া ঝুলে পড়েছে, জরজর, কোঁচকানো। বাঁ হাতে একটা স্কুলটীচারী ছাতা আর উনিশশো ছত্রিশ মডেলের ভ্যানিটি ব্যাগ। ডান হাতে রিসেপশন কাউন্টারের ব্রাস-রেল আঁকড়ে ধরে পুরু লেন্সের চশমার ভিতর দিয়ে চেয়ে রয়েছেন বৃদ্ধা ব্যস্ত ক্লার্কের

মুখের দিকে। রানা লক্ষ করল, পা দুটো কাঁপছে মহিলার, মনে হচ্ছে ব্রাস-রেল ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবেন হুড়মুড় করে।

মুখ না তুলেই জবাব দিল রিসেপশন ক্লার্ক, 'উঠেছিলেন, কিন্তু আজ চলে যাওয়ার কথা, খুব সম্ভব চলে গেছেন।'

'কোথায়?' ফ্যাকাসে হয়ে গেল বৃদ্ধার মুখটা।

'জানি না,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে কথাটা বলে বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইল ক্লার্ক মহিলার মুখের দিকে, সম্ভ্রান্ত চেহারা চিনতে ভুল করল না, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল চাবি ঝোলানো বোর্ডটার দিকে, একটা মোটা রেজিস্টার উল্টে দেখল। 'দেড়টায় ফ্লাইট। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট আছে।' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। 'এতক্ষণ পর্যন্ত কি করছে লোকটা ঘরে বসে?' হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে ধরল ক্লার্ক, পরমুহূর্তে চোখ গেল তার পোর্টারের দিকে, সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল মহিলাকে, 'ট্যাক্সি এসে গেছে। দেখা হবে না এখন। ওই দেখুন মালপত্র নামছে।'

পাশ ফিরে দেখলেন মহিলা ব্যস্ত-সমস্ত পোর্টারকে, সুটকেসের ওপর 'মাসুদ রানা' লেখা লেবেলটা পড়লেন। দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল পোর্টার দুই হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে। শূন্যদৃষ্টিতে সেদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মহিলা, চলে যাওয়ার জন্যে এক পা বাড়িয়ে টলে উঠলেন, মাথাটা বোধহয় ঘুরে উঠল, চট্ করে একটা চেয়ার ধরে সামলে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন।

শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল রানা, তারপর উঠে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধার সামনে।

'আপনার কি খুবই জরুরী দরকার ছিল?'

'হ্যাঁ, বাবা।' ফোঁস করে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মহিলা। চোখ দুটো ঘোলাটে। কাঁপা গলায় বললেন, 'মহা ভুল হয়ে গেল। আরও আগে রওয়ানা হওয়া উচিত ছিল। ট্রামে-বাসে যা ভিড়,

উঠতেই পারলাম না। হেঁটে এসেছি, তি–ন মাইল।'

'খুব বেশি সময় লাগবে? মানে, কথা কি অনেক বেশি?'

'না বাবা। বেশি কথা নয়। কিন্তু বুঝতে পারছি, এখন তার দম ফেলবারও সময় নেই। ভুল হয়ে গেছে আমার। এত ব্যস্ততার মধ্যে–'

ঘড়ি দেখল রানা বলল, 'আচ্ছা, কি ব্যাপারে কথা বলুন তো?'

সরাসরি রানার মুখের দিকে চাইলেন বৃদ্ধা। 'আমার ছেলের ব্যাপারে।' আশার আলো ফুটে উঠল দুই চোখে। 'তুমি পারবে বাবা দেখা করিয়ে দিতে?'

'কিছু মনে করবেন না, আমার আগেই পরিচয় দেয়া উচিত ছিল–আমিই মাসুদ রানা। চলুন না ট্যাক্সি করে দমদম যাওয়ার পথে আপনার কথা শুনব?'

রানার পরিচয় জেনে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বৃদ্ধার, কিন্তু শেষের কথাটায় ম্লান হয়ে গেল আবার। চট্ করে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'আমার পেছনে পুলিসের লোক লেগে আছে। ওরা ধরে ফেলবে। উঠতেই দেবে না তোমার ট্যাক্সিতে।

হঠাৎ রানার মনে হলো মহিলা পাগল নয়তো? কিন্তু তাহলে ওর নাম জানল কি করে? ঘড়ি দেখল আর একবার। গিলটি মিঞাকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে আসছে এদিকে লিফট থেকে নেমে। সময় নেই। কি করবে বুঝতে পারছে না রানা।

রানার ভাবটা লক্ষ করলেন মহিলা। বললেন, 'ঠিক আছে, যত সংক্ষেপে পারি বলছি। অনিলকে চেনো তুমি?'

'অনিল–মানে, অনিল চ্যাটার্জী?' বসে পড়ল রানা সামনের চেয়ারে।

চোখ দুটো সামান্য একটু বিস্ফারিত হয়ে গেছে রানার। ভাল

করেই চেনে সে অনিলকে। দেড় বছর আগে একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা একটা অ্যাসাইনমেন্টে। তুখোড় ছেলে। ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের সেরা এজেন্টদের একজন অনিল চ্যাটার্জী। ইনি কি তারই মা? তাহলে এঁর পিছনে পুলিসের লোক কেন?

'হ্যাঁ। আমি তার মা। দেড় মাস আগে রোমে গিয়েছিল ও। পৌঁছে চিঠি দিয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে আর কোন খবর নেই।' চোখ দুটো ছলছল করে উঠল বৃদ্ধার। 'যখনই বাইরে যায়, যেখানেই থাকুক সপ্তাহে দুটো করে চিঠি দেয় ও। কিন্তু এবার কোন খবর নেই ওর।'

'ওর অফিসে জানিয়েছেন?'

'সবাইকে জানিয়েছি। কেউ কোন সাহায্য করবে না। ও ফরেন সার্ভিসের লোক, মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সে জানিয়েছি, পুলিসকে জানিয়েছি, কোন লাভ হয়নি। এমন ভাব দেখাচ্ছে সবাই যেন অনিলের কিছু হয়ে থাকলে ওদের কিছুই এসে যায় না। আমার মন বলছে ভয়ানক কিছু একটা ঘটে গেছে। নিজে যাব মনে করে আমার পাসপোর্টটা রিনিউ করবার জন্যে দিয়েছিলাম দুই সপ্তাহ আগে, ওরা বলছে হারিয়ে গেছে সেটা, আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তার আগে থেকেই আমার পেছনে লোক লেগে গেছে, যেখানেই যাই না কেন, আমাকে অনুসরণ করছে সাদা পোশাক পরা দুজন পুলিস। এখানেও এসেছে পেছন পেছন।

মহিলা পাগল কিনা সে সন্দেহটা আবার একবার উঁকি দিল রানার মনের কোণে। গিলটি মিঞা এসে দাঁড়াল পাশে। চঞ্চল হয়ে উঠল সে রানাকে নির্বিকার চিত্তে গল্প করতে দেখে।

'ট্যাক্সি ডেঁড়িয়ে আচে, স্যার। যাবেন না? হাতে আর সোমায় নেই।'

'বাইরে দুজন টিকটিকি রয়েছে, ওদের সঙ্গে খানিক গল্প-

গুজব করোগে যাও। ভেতরে ঢুকতে দেবে না।'

দুই সেকেন্ড অবাক হয়ে চেয়ে রইল গিলটি মিঞা রানার মুখের দিকে, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। রানা ফিরল বৃদ্ধার দিকে।

'আমার কাছে কি সাহায্য আশা করছেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা।

'তা আমি ঠিক জানি না, বাবা। অনিল দেখা করতে বলছে তোমার সঙ্গে।' ব্যাগ থেকে একটা রঙিন পিকচার-পোস্টকার্ড বের করলেন বৃদ্ধা, রানার হাতে দিয়ে বললেন, 'গতকাল এসেছে এটা।'

কার্ডটা উল্টে-পাল্টে দেখল রানা। ভেনিসের ব্রিজ অফ সাইজের (দীর্ঘশ্বাসের সেতু) রঙিন ছবি। ইটালিয়ান পোস্ট অফিসের সীলে তারিখ দেখা যাচ্ছে পাঁচদিন আগের। প্রাপকের নাম অরুণা ভট্টাচার্য, ২৬/২ যদুনন্দন গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে একটা ছোট্ট চিঠি, ইংরেজিতে লেখা। বাংলা মানে করলে দাঁড়ায়:

কাজে আটকে গেছি, ছুটতে পারছি না।
শরীরটাও খারাপ। কাগজে দেখলাম, মাসুদ
রানা ভিয়েনায় আসছে। ওকে আমার প্রীতি
জানিয়ো। সেরা তিনটে হোটেলের যে কোন
একটায় পাবে। অবশ্যই দেখা করবে।
ইতি—এস.ও.সলিল।

অবাক হয়ে বৃদ্ধার মুখের দিকে চাইল রানা।

'কার চিঠি এটা? অনিলের নয়! আপনার উদ্দেশেও লেখা নয়। অথচ আমার নাম...'

'এ চিঠি অনিলেরই।' কাঁপা গলায় বললেন বৃদ্ধা। 'ওরই হাতের লেখা। ঠিকানাটা ওর মামা বাড়ির। বিয়ের আগে আমার

নাম ছিল অরুণা ভট্টাচার্য। সলিল ওর বাবার নাম। এস.ও. সলিল মানে সান অফ সলিল, তার মানে অনিল। আজ সকালে পৌঁছে দিয়ে গেছে এটা আমার কাছে আমার ভাইপো। আবার পড়ে দেখো বাবা, ও কিছু একটা বলতে চাইছে তোমাকে এই চিঠিতে। নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে কোন।'

আবার একবার কার্ডটার দিকে চেয়েই মনে মনে চমকে গেল রানা। 'পিপ্‌ল্‌ হু ক্রসড্‌ দা ব্রিজ অফ সাইজ ওয়্যার কন্‌ডেম্‌ড।' অনিল বোঝাতে চাইছে বিপদে পড়েছে সে, হয় আত্মগোপন করে আছে নয়তো বন্দী হয়েছে—বেরোতে পারছে না। চিঠির শেষে নাম সই করবার ছলে এস.ও.এস. বিপদসংকেতটা এবার আর ওর চোখ এড়াল না। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা। ঘড়ি দেখল—কাঁটায় কাঁটায় একটা।

গিলটি মিঞা এসে দাঁড়াল আবার। অস্থির হয়ে উঠেছে বেচারা। জীবনে এই প্রথম সত্যিকার অর্থে বিদেশ চলেছে সে। উৎসাহ আর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে সকাল থেকে।

'সোমায় নেই, স্যার। ট্যাক্সিআলা বলচে এখুনও রওনা দিলে হয়তো...'

'বাইরের দুজন কি করছে?' প্রশ্ন করল রানা।

'গোমড়ামুকো ভূত, স্যার। কতা বলে না। উই উদিকে পানের দোকানে...'

'ঠিক আছে। তুমি এক কাজ করো, আজকে যাচ্ছি না আমরা, ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে মালপত্র ঘরে তোলার ব্যবস্থা করো। আর আজকের টিকিটগুলো ক্যান্সেল করে কালকের জন্যে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করো। পারবে না?'

'নিচ্চয়।' বারকয়েক রানা ও বৃদ্ধার মুখের দিকে চাইল গিলটি মিঞা, তারপর হাসল। 'ব্যাপারেশন খারাপ!'

দ্রুতপায়ে চলে গেল গিলটি মিঞা। অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন

বৃদ্ধা। বললেন, 'তোমার অনেক ক্ষতি...'

'কিচ্ছু না। এজন্যে ভাববেন না আপনি।' উঠে দাঁড়াল রানা। চলুন, উপরে গিয়ে আগাগোড়া সবটা ব্যাপার শোনা যাক।'

দুই

চারতলার স্যুইটে একটা সোফায় বৃদ্ধাকে বসিয়ে মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসল রানা। মহিলার অস্বস্তি দূর করবার জন্যে হাসল মিষ্টি করে।

'আর কোন তাড়া নেই। এবার ধীরে সুস্থে বলুন দেখি ব্যাপারটা?'

'কি দুশ্চিন্তার মধ্যে যে আছি বাবা, কি বলব। অনিল আমার একমাত্র সন্তান। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর স্কুলের মাস্টারি করে বহু কষ্টে মানুষ করেছি ওকে। ভেবেছিলাম বুড়ো বয়সে বুঝি নিশ্চিন্ত হতে পারব, ছেলেটার একটা বিয়ে দিয়ে ওকে ঘরকন্না-সংসারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই মুক্তি পাব। কিন্তু তা হলো না। ছেলে এমন চাকরি নিল যে বছরের মধ্যে নয় মাসই থাকতে হয় ওকে বিদেশে। ফরেন সার্ভিস হলেই এত বদলি হয় নাকি, বাবা?'

রানা বুঝল, অনিল যে ঠিক কি কাজ করে জানা নেই ওর মায়ের। এক্ষুণি কিছু না জানানোই ভাল মনে করে চুপ করে থাকল। কথা বলেই চললেন বৃদ্ধা।

'আজ এদেশ, কাল ওদেশ, কোথাও থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না ছেলেটাকে। চারমাস রোমে থাকার পর দেশে ফিরে এসে আবার যখন রোমে গেল এবার, আমি মনে করলাম যাক, এবার কিছুটা সুস্থির হয়েছে বুঝি, মেয়ে দেখতে শুরু করেছিলাম, এমনি সময়ে উপস্থিত এই বিপদ।'

'বিপদটা টের পেলেন কবে? পৌঁছে যে চিঠি দিয়েছিল তাতে কোন আভাস ছিল?'

'না, বাবা। সাধারণ চিঠি–পৌঁছেচি, ভাল আছি, তুমি কোন চিন্তা কোরো না, আর তোমার দুটি পায়ে পড়ি অজানা অচেনা কোন মেয়েকে পছন্দ করে বোসো না, সময় হলে আমি জানাব তোমাকে, তোমার অমতে বিয়ে করব না এটুকু জেনে রেখো–এইসব কথা। এ চিঠির পর সাতদিন পেরিয়ে গেল, আর কোন চিঠি না পেয়ে অবাক হয়েছি কিন্তু ঘাবড়ে যাইনি। দু'সপ্তাহ পর যখন আমার চিঠিগুলো রি-ডাইরেক্টেড হয়ে ফেরত আসতে আরম্ভ করল, তখন ঘাবড়ে গেলাম। ট্রাঙ্ক-কল করলাম ওর হোটেলে–নেই। এমব্যাসীতে ট্রাঙ্ক-কল করলাম–কথার জবাবই দিতে চায় না, উল্টে ওরাই আবোল-তাবোল প্রশ্ন শুরু করে দিল, অনেক অনুরোধ উপরোধ করেও কোন খবর বের করতে পারলাম না অনিলের, শেষে হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলাম। গেল দেড়শো টাকা। ততক্ষণে আমার মন বলতে শুরু করেছে, ভয়ানক কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে অনিলের, নিশ্চয়ই খুবই অসুস্থ তাই খবরটা চেপে যাচ্ছে সবাই আমার কাছে।

'ছুটে গেলাম সন্তোষের আপিসে। অনিলের বন্ধু। ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। কোন অসুবিধে হলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে রেখেছিল অনিল আমাকে। আগেও একবার ওর সাহায্য দরকার পড়েছিল, পাকিস্তানে আটকে গিয়েছিল তখন অনিল, অনেক সাহায্য করেছিল তখন এই সন্তোষ। দেখা করতেই খুবই আদর-আপ্যায়ন করল, কথা দিল তিনদিনের মধ্যে অনিলের খবর বের করে জানাবে আমাকে, যেন কোন দুশ্চিন্তা না করি। কিন্তু কিছুই করল না ছেলেটা। আর দেখাই পেলাম না ওর। তিনদিন পর ওর আপিসে গেলাম–নেই। পরদিন গেলাম–নেই! আপিসের আর সবাই কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে

দেখছে আমাকে, ব্যবহার বদলে গেছে, কেমন যেন নির্বিকার, কঠিন। একজন অফিসার আমাকে জানিয়ে দিল, অনিলের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি, জানা গেলে খবর দেয়া হবে আমাকে, কষ্ট করে ওদের আপিসে যাওয়ার দরকার নেই।'

'এটা কতদিন আগের ঘটনা?'

'বিশ-একুশ দিন। পরদিন ফোন করলাম আবার সন্তোষের আপিসে। আপিসেই ছিল, কিন্তু কথা বলল না। আরেকজন কে যেন খুব কড়া গলায় বলল, শুধু শুধুই বিরক্ত করছি ওদের, জানাবার মত কোন খবর থাকলে আপনিই জানাবে ওরা, ধন্না দিলে কোন ফল হবে না।'

স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মলিন হয়ে গেল অপমানিতা বৃদ্ধার মুখ, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমি বুঝতে পারলাম কোন সাহায্য করবে না এরা। সোজা গেলাম মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সে। সেখানেও একই ব্যাপার, প্রথমে তো কেউ দেখাই করবে না আমার সাথে। কারও সময় নেই। ধন্না দিয়ে পড়ে রইলাম, অনিলের সংবাদ না নিয়ে কিছুতেই যাব না আমি। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ডাকা হলো আমাকে একজন ডেপুটি সেক্রেটারির ঘরে। বসতে পর্যন্ত বলল না, ঘরে ঢুকতেই অনিলের বয়সী একটা ছেলে ভ্রূ কুঁচকে কটমট করে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কেন মিছেমিছি আমাদের বিরক্ত করছেন? এটা ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপার, ওদের কাছে যান।' কেঁদে ফেললাম, ইন্টেলিজেন্স থেকে যে অনর্থক ঘোরাচ্ছে সে কথা বললাম, কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হলো না। সোজা বলে দিল, 'এটা আমাদের কাজ নয়, আপনি এবার আসুন।' রুমাল বের করে চোখ মুছলেন বৃদ্ধা চশমা খুলে।

'তারপর?'

'আমি বললাম, আমার ছেলের সংবাদ আমাকে জানতেই

হবে। আপনারা সবাই মিলে যে ব্যবহার করছেন তাতে সোজা পত্রিকা অফিসে গিয়ে সব ব্যাপার জানানো ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।'

ছেলের জন্যে মা যে কতটা করতে পারে উপলব্ধি করে রীতিমত মুগ্ধ হয়ে গেল রানা। বলল, 'ঠিক বলছেন। ওরা কি বলল এ কথা শুনে?'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল ডেপুটি সেক্রেটারি। আমার মনে হলো এক্ষুণি বুঝি গায়ে হাত তুলে বসবে। কিন্তু তা না করে আমাকে বসবার ইঙ্গিত করে ছুটে বেরিয়ে গেল ছেলেটা কামরা থেকে। প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো একজন সেক্রেটারির ঘরে, সেখানে খুবই কটু ভাষায় ধমক দেয়া হলো আমাকে। জানিয়ে দেয়া হলো, ইচ্ছে করলে পত্রিকা অফিসে যেতে পারি আমি, কিন্তু গেলে পস্তাতে হবে আমাকেই। অনিলের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে কোন রকম পাবলিসিটি হলে ক্ষতি হবে অনিলেরই। এ ব্যাপারে বেশি খোঁজ খবর করতে যাওয়াটা নাকি আমার জন্যেই বিপজ্জনক। আমার এখন চুপচাপ ঘরে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এমন চোখ পাকিয়ে কথাগুলো বলল লোকটা যে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম আমি। অনিলের খোঁজ খবর করতে গিয়ে যদি ওর অনিষ্ট হয়, সেটা আমি চাই না। কিন্তু কেন ওর অনিষ্ট হবে, ওদের কর্মচারী ইটালিতে গিয়ে কি বিপদে পড়ল সে সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না বা জানতে চায় না কেন, এরকম অনর্থক দুর্ব্যবহারই বা কেন করছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। হতাশ হয়ে বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে। কিছুদূর হাঁটবার পরই বুঝতে পারলাম আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। উনিশশো তিরিশ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িত ছিলাম, কাজেই এদের চিনতে ভুল হলো না আমার। একজন সামনে আর একজন পেছনে সর্বক্ষণ লেগে

আছে এরা আমার সঙ্গে।'

'পাসপোর্টের ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন?'

'হ্যাঁ। কয়েকদিন ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবলাম। বুঝলাম কারও কাছ থেকে কোনরকম সাহায্যের আশা নেই। শেষে ঠিক করলাম আমি নিজেই যাব। রিনিউ করার জন্যে জমা দিলাম সেটা। হচ্ছে, হবে, দেখি কি করা যায়, ইত্যাদি করে বেশ কয়েকদিন দেরি করিয়ে দেয়ার পর একদিন ওদের অফিসে গিয়ে চেপে ধরলাম। আমার ফাইলটাই নেই, হারিয়ে গেছে। আবার নতুন করে দরখাস্ত দেয়ার পরামর্শ দিল আমাকে ওদের এক অফিসার, কথা দিল যত শীঘ্রি সম্ভব যাতে পাই সে চেষ্টা করবে সে। বুঝলাম সবই। হাল ছেড়ে দিয়ে চোখের জলে ভাসলাম কয়েকদিন, প্রার্থনা করলাম ভগবানের কাছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, ছটফট করলাম অসহায় যন্ত্রণায়–এমনি সময়ে এল এই কার্ডটা। বেঁচে আছে, এটুকু বুঝতে পারছি, কিন্তু কেন সরাসরি আমার ঠিকানায় না পাঠিয়ে মামাবাড়ির ঠিকানায় পাঠাল ও কার্ডটা, বুঝতে পারছি না। বিপদে পড়েছে বুঝতে পারছি; কিন্তু কি বিপদ, কি ধরনের কতবড় বিপদ, কিছুই বুঝতে পারছি না। হু-হু করে কাঁদছে শুধু বুকের ভিতরটা।'

বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙে পড়বার আগেই চট করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনি কি কিছুই আঁচ করতে পারছেন না? কি ধরনের কাজ করত অনিল কিছুই জানা নেই আপনার?'

'না, বাবা। ওর কাজকর্মের ব্যাপারে কিছুই বলেনি ও আমাকে কোনদিন।'

'আচ্ছা, আপনার কি কোনদিন সন্দেহ হয়েছে যে আপনার ছেলে হয়তো ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগে কাজ করে?'

ঝট করে চাইলেন বৃদ্ধা রানার চোখের দিকে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন।

'কোনদিন ভাবিনি। হতে পারে। এখন মনে হচ্ছে, হতে পারে এটা।' ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন বৃদ্ধা আরও কিছুক্ষণ। 'ঠিকই বলেছ। সম্ভব। এদের কথাবার্তা, ব্যবহার দেখে তাই তো মনে হচ্ছে এখন। কোন দেশের স্পাই যদি অন্য দেশে ধরা পড়ে তাহলে তার পরিচয় অস্বীকার করে তার নিয়োগকারী দেশ—এ রকম কি যেন পড়েছিলাম কোথাও। তাই কি ঘটেছে অনিলের ভাগ্যে?' পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে রানার মুখের দিকে চেয়ে জবাব খুঁজছে বৃদ্ধার ব্যাকুল দৃষ্টি।

'ঠিক কি যে ঘটেছে তা বের করতে হবে আমাদের। এখান থেকে যতটা সম্ভব চেষ্টা করব আমি আজ খবর বের করবার। কয়েকজন হোমড়া-চোমড়া অফিসারের সঙ্গে জানাশোনা আছে আমার। যতটা জানা যায় আজই সন্ধ্যায় জানাব আমি আপনাকে। যদি এখান থেকে তেমন কিছু খবর সংগ্রহ করতে না পারি তাহলে ভিয়েনা থেকে ভেনিসে যাব, যে করে হোক খবর বের করবই আমি। আপনার ঠিকানাটা দিয়ে আপনি সোজা বাসায় চলে যান। কিচ্ছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রানার কণ্ঠস্বরে নিজের ক্ষমতার ওপর আশ্চর্য এক আস্থা আর আত্মবিশ্বাসের রেশ উপলব্ধি করতে পারলেন বৃদ্ধা। দুর্দমনীয় একটা প্রাণ-স্পন্দন রয়েছে এর ভিতর। মনে হয় টগবগ করে ফুটছে এর ভিতরটা, কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই।

'তুমি কি ভিয়েনায় চলেছ?'

'তিনদিনের একটা সম্মেলনে যাচ্ছি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে।'

'তুমি বাংলাদেশের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু মনে করো না বাবা, তুমি অনিলের বন্ধু, কিন্তু তোমার নাম কোনদিন শুনিনি আমি ওর মুখে। কতদিনের বন্ধু তোমরা?'

‘ঠিক বন্ধু বললে ভুল হবে। আমরা পরিচিত। সাতদিনের পরিচয়। দেড় বছর আগে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে একটা ব্যাপারে কাজ করেছিলাম আমরা সাতদিন। তখনই চিনেছিলাম ওকে আমি সৎ, সাহসী এবং বুদ্ধিমান ছেলে হিসেবে। তারপর ওর আর কোন খবর পাইনি, এতদিন পর আজ আপনার মুখেই ওর নাম শুনলাম প্রথম।’

অবাক হলেন বৃদ্ধা। ‘এই সামান্য পরিচয়েই ওর জন্যে এতটা ক্ষতি স্বীকার করে নিলে তুমি! আজকের ফ্লাইট ক্যান্সেল করলে, ভিয়েনা থেকে ভেনিসে যাবে, সময় নষ্ট হবে, টাকা নষ্ট হবে—’

মৃদু হাসল রানা। ‘এ নিয়ে আপনি ভাববেন না। সত্যি কথা বলতে কি, ওর জন্যে আমি ফ্লাইট ক্যান্সেল করিনি। আমি বিদেশী লোক, ভারতের রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকারও আসলে নেই আমার। যেটুকু করছি বা করতে চাইছি সেটা না করে উপায় ছিল না আমার।’

‘কেন, বাবা?’

‘সন্তানের জন্যে একজন মায়ের প্রাণ কাঁদবে, আর আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাব, সেটা কি সম্ভব? মায়ের চেয়ে বড় আর কি আছে পৃথিবীতে?’

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধা।

রানা বলল, ‘আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমার সাধ্যমত আমি সবই করব অনিলের জন্যে। কথা দিচ্ছি। অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে যে কোন মানুষের একেবারে ভেঙে পড়ার কথা। তবু তো আপনি অনেকখানি শক্ত হয়ে আছেন। আর কয়েকটা দিন সহ্য করতে হবে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, আমার মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে।’

একটু সামলে নিলেন বৃদ্ধা। শীর্ণ একখানা হাত রাখলেন রানার শক্তিশালী বাহুতে।

‘তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। ধন্যবাদ দিয়ে তোমার মহত্ত্বকে ছোট করাও ঠিক নয়। আশীর্বাদ করি, সুখী হও, সফল হও জীবনের সব ক্ষেত্রে।’

বাসার ঠিকানা দিয়ে উঠে পড়লেন বৃদ্ধা। বললেন, ‘মনটা অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে, বাবা। সব জায়গায় বাধা পেয়ে পেয়ে হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, চাপা আশঙ্কা আর উদ্বেগ কুরে কুরে খাচ্ছিল বুকের ভিতরটা। কোন দিকেই কোন পথ পাচ্ছিলাম না। কিভাবে যে কেটেছে গত একটা মাস!’

‘সবটা বোঝা একা আপনার কাঁধে ছিল বলেই এরকম লেগেছে। এখন তো আর আপনি একা নন। আমিও আছি আপনার সঙ্গে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন গিয়ে। আমি চেষ্টা করব যেন আপনাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে না হয়।’

বৃদ্ধাকে বিদায় দিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে নিল দু’মিনিটের মধ্যেই। ঘরে এসে ঢুকল গিলটি মিঞা। ওর দিকে না চেয়েই হুকুম করল রানা, ‘একটা ট্যাক্সি ডাকো।’

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে জনাকীর্ণ রাস্তায় হাঁটছেন বৃদ্ধা। পান দোকানের সামনের টুল থেকে উঠে দাঁড়াল দু’জন লোক।

তিন

রঞ্জন চৌধুরী। নামটা শুনলে মনে হয় কোন ছেলে ছোকরা হবে হয়তো। আসলে বয়স আটান্ন বছর। বেঁটে খাটো, ধুতি-শার্ট এবং তার ওপর পুরানো ছাঁটের কোট পরা সাদাসিধে লোকটিকে দেখলে যে কেউ মনে করবে কোন সরকারী অফিসের হেড ক্লার্ক, বড়জোর সেকশন অফিসার। আসলে ভদ্রলোক ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ। এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ডাকসেঁটে চীফ আর আসেনি

এই ডিপার্টমেন্টে।

অফিসার্স ক্যান্টিন থেকে খাওয়া সেরে লাউঞ্জের নির্জন কোণে পার্কের দিকে খোলা একটা জানালার ধারে বসলেন তিনি। বেয়ারা কফি দিয়ে গেল এক কাপ। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসে রইলেন চুপচাপ। গভীর কোন চিন্তায় মগ্ন।

কফির কাপে চুমুক না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়াল রঞ্জন চৌধুরীর টেবিলের পাশে।

'এই যে! কেমন আছেন? বসতে পারি?'

ঝট করে রানার মুখের দিকে চাইলেন চীফ। রানাকে দেখে একটু অবাক হলো দৃষ্টিটা। মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। কেমন আছেন? আমি জানতাম আপনি এতক্ষণে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন ভিয়েনার পথে।'

'কাল যাচ্ছি।' বসল রানা চীফের মুখোমুখি।

'ওখান থেকে সোজা ফিরে আসবেন, না আরও কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে আছে?'

'ভাবছি একটু ভেনিস ঘুরে আসব।'

'দ্যাট্স্ গুড। ফেস্টিভ্যালটা দেখার জন্যে তো? আমি শুনেছি, দারুণ নাকি ওদের লা সেনেরেন্টোলা।'

ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে আলোচনায় রানার তেমন উৎসাহ নেই লক্ষ করে সরাসরি রানার চোখের দিকে চাইলেন রঞ্জন চৌধুরী। ভুরু নাচালেন। 'কি খবর?'

'একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার।'

ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে উঠেই আবার সোজা হয়ে গেল। 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কি ব্যাপারে?'

'অনিল চ্যাটার্জীর ব্যাপারে আমি আগ্রহী।'

স্থির দৃষ্টিতে রঞ্জন চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে কথাটা উচ্চারণ

করল রানা, আশা করেছিল এ প্রশ্ন শুনে চীফের কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ করলে কিছুটা আঁচ করতে পারবে সে ব্যাপারটা। কিন্তু কোনরকম কোন প্রতিক্রিয়া টের পাওয়া গেল না তার মধ্যে। কোটের পকেট থেকে একটা চারমিনারের প্যাকেট বের করে খুলে এগিয়ে ধরলেন তিনি রানার দিকে, রানা একটা বের করে নিতেই নিজেও ঠোঁটে লাগালেন একটা, রানার গ্যাস লাইটারের আগুনে ধরিয়ে নিলেন সিগারেট। লম্বা করে গোটা কয়েক টান দিয়ে ঠোঁট থেকে আঙুলের ফাঁকে নিয়ে এলেন সিগারেটটা। রানার চোখের ওপর স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি।

'অনিল, না? অনিল চ্যাটার্জী। হুম। তা, আপনি তার ব্যাপারে উৎসাহী কেন?'

'নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছিলাম কিছুদিন। ওর সততা আর দেশপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভাল লেগেছিল ছেলেটাকে। ওর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না শুনলাম।'

'আমিও তাই শুনেছি,' বললেন রঞ্জন চৌধুরী। কফির কাপে চুমুক দিলেন আরেকটা। 'আজকাল সবকিছুতেই ভেজাল। কফির সে স্বাদ আর নেই। সেই ছাত্রজীবন থেকে খাওয়ার পর এক কাপ করে কফি খাওয়ার অভ্যাস...'

'কি হয়েছে ওর?'

চোখ মিটমিট করলেন রঞ্জন চৌধুরী।

'কার কি হয়েছে?'

মৃদু হাসল রানা। 'এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আপনি, মিস্টার চৌধুরী। অনিল নিখোঁজ। আমি জানতে চাই কি হয়েছে ওর।'

'আমি জানি না। সত্যিই জানি না।' কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠবার উপক্রম করলেন রঞ্জন চৌধুরী। 'এবার আমাকে উঠতে হয়। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। সন্ধের সময় আবার

একটা থিয়েটার দেখার নেমন্তন্ন রয়েছে—সস্ত্রীক। অফিসের কাজে দেরি করে ফেললে একেবারে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। কি যে মজা পায় ওরা এসবে বুঝি না। থিয়েটার-ফিয়েটারে আমার কোনদিনই...'

'বিপদে পড়েছে অনিল?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রঞ্জন চৌধুরী।

'বড় নাছোড়বান্দা লোক আপনি, মশায়।' সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন, 'সেটা সম্ভব। আমি ঠিক জানি না, এবং সত্যি বলতে কি খুব একটা কেয়ারও করি না। উঠি এবার।'

একটু সামনে ঝুঁকে এল রানা। 'এক মিনিট। অনিলকে আমি সৎ ছেলে হিসেবে জানি। ওর মা আজ এসেছিলেন আমার কাছে। আপনি যদি এভাবে এড়িয়ে যান তাহলে অন্যত্র খবর সংগ্রহ করতে হবে আমার।'

একটু যেন থমকে গেলেন রঞ্জন চৌধুরী। দৃষ্টিটা একটু কাত করে ভাবলেন তিন সেকেন্ড, তারপর অমায়িক ভঙ্গিতে ফিরলেন রানার দিকে। 'ছোট্ট একটা উপদেশ দেব আপনাকে। নিজের চরকায় তেল দিন। এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করবার নেই। ভেনিস যাচ্ছেন যান, ফুর্তি করে ফিরে যান নিজের দেশে।'

কঠোর হয়ে গেল রানার মুখটা। বলল, 'ধন্যবাদ! অনিলকে খুঁজে বের করতে চাই আমি। আপনার সাহায্য না পেলে অন্য রাস্তা দেখতে হবে আমাকে।'

রানার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন রঞ্জন চৌধুরী, রানার চোখে মুখে দেখলেন অনমনীয় দৃঢ়-সংকল্প। মুচকে হাসলেন তিনি।

'আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না বলে দুঃখিত। শুধু এটুকু বলতে পারি, নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরেছে অনিল চ্যাটার্জী, এখন আর কারও কিছু করবার নেই। ওকে নিয়ে কারও

মাথা ঘামানোও উচিত বলে মনে করি না আমি। আপনাকে এতটা খোলাখুলি ব্যাপারটা বললাম এই জন্যে যে আমি চাই না আপনি এর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে জলটাকে আরও খানিকটা ঘোলাটে করে তুলুন। ইট্স্ আ ম্যাটার অফ স্টেট—এর বেশি আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এর ভেতর নাক গলাবেন না। আরও সহজ করে বলতে হবে?'

চৌধুরীর চোখে চোখ রাখল রানা। বলল, 'না। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না আমি। গতকাল যে ছিল আপনাদের বিশ্বস্ত কর্মচারী হঠাৎ আর তার ভালমন্দে কিছুই এসে যায় না আপনাদের, চোখ উল্টে নিচ্ছেন বেমালুম; এটা কেমন উদ্ভট ঠেকছে আমার কাছে। কিন্তু সেটা আপনাদের ব্যাপার, আপনারা বুঝবেন। তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি, অনিলের মায়ের সঙ্গে আপনারা যে ব্যবহার করেছেন, যেভাবে হেস্তনেস্ত করেছেন সন্তানের সংবাদ জানার জন্যে ব্যাকুল এক বৃদ্ধা মাকে—'

অবাক চোখে রানার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন রঞ্জন চৌধুরী, হঠাৎ হেসে উঠলেন।

'এই সব ভাবালুতা ত্যাগ করবার ট্রেনিং দেয়া হয় না আপনাদের? এরকম সস্তা আবেগ আপনাকে কত বড় বিপদের মধ্যে ফেলতে পারে সে শিক্ষা দেননি আপনাদের চীফ?'

'তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, সব কিছুর গোড়ার কথা মনুষ্যত্ব। এখানে কিছুর সাথে কোন আপোষ নেই। সবার ওপরে স্থান দিতে হবে একে। শিখিয়েছেন, মনুষ্যত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণটা বিসর্জন দিতে দ্বিধা কোরো না। কারণ, এটা নষ্ট হয়ে গেলে ওই প্রাণের আর কোন দাম থাকে না।'

বাঁকা করে হাসলেন রঞ্জন চৌধুরী।

'ইটস্ আ ডেঞ্জারাস গেম, মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান। হয়

মারো, নয় মরো। ওইসব ভাবালুতা হয়তো বই পুস্তকে বেশ মানানসই মনে হতে পারে, বাট নট ইন প্র্যাকটিকাল মেটিরিয়ালিস্টিক ওঅর্লড। এনি ওয়ে, আপনি বা আপনার চীফ যদি ভাব জগতে বিচরণ করে আনন্দ লাভ করেন, আমার আপত্তির কিছুই নেই। আপনাদের ভাবের বোঝা আমাদের ঘাড়ে না চাপালেই আমরা খুশি হব। যাই হোক, আপনার শেষ প্রশ্নটার উত্তর দিয়েই আমি উঠব। অনিলের মা-র সঙ্গে যে ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য হয়েছি, সেটা আমাদের দোষ মনে করলে আপনি মস্ত ভুল করবেন। অনিল যা করেছে সেটা করার আগে তার একবার মায়ের কথা ভাবা উচিত ছিল। চলি। দেখা হবে।'

চলে গেলেন রঞ্জন চৌধুরী। এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। স্নেহ মায়া মমতা ঢুকতে পারবে না ওখানে, এমনই কড়া পাহারা। অ্যাশট্রেতে টিপে মারল রানা চারমিনারটা। অনিল সম্পর্কে কিছুই বলেননি চৌধুরী, তবু কয়েকটা টুকরো কথার তাৎপর্য মনে মনে বিচার না করে পারল না সে। বোঝা যাচ্ছে, অনিলের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে এরা পরিষ্কার ভাবে ওয়াকিফহাল। এটা ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার—স্বীকার করেছেন চৌধুরী। নিজের পায়ে কুড়োল মেরেছে অনিল, এখন আর কারও কিছু করবার নেই। ভাবনার কথা। মনে মনে স্থির করল রানা, এদের হয়তো করবার কিছুই নেই, কিন্তু আমার করবার কিছু থাকতেও পারে। আশাবাদী হওয়াই ভাল।

মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সের কল্যাণ দাশগুপ্তের কাছে গিয়েও ঠিক একই রকম ধাক্কা খেলো রানা। একটি কথাও বের করা গেল না। অনিলের ব্যাপারে কিছুই জানে না তারা। ঠেসে ধরায় বলল খোঁজ খবর নিয়ে সপ্তাহ খানেক পরে জানাবার চেষ্টা করবে। উঠে আসবার আগে উপদেশ দিল—'আমার মনে হয় তোমার এ ব্যাপারে নাক না গলানোই ভাল। এ থেকে দূরে

থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অনিল সম্পর্কে কিছুই যদি না জানবে তাহলে এই উপদেশ কি করে দিচ্ছে জিজ্ঞেস করায় লজ্জিত হাসি হেসে বলেছে–তোমার যা খুশি ভাবতে পারো, আমি এর বেশি আর কোন সাহায্য করতে পারছি না, রানা।'

ইন্টেলিজেন্সের ডি.আই. জি. সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তার অজান্তে দু'একটা তথ্যের ভাঙা অংশ উদ্ধার করা গেল মাত্র, আর বিশেষ কিছুই উপকার হলো না।

সবারই ইঙ্গিত যেদিকে, সেটা মেনে নিতে কেমন যেন দ্বিধা হচ্ছে রানার। অনিলকে বিশ্বাসঘাতক, রাষ্ট্রদ্রোহী ভাবতে পারছে না কিছুতেই। সত্যেন বাবু স্বীকার করেছেন যে অনিলের মা-র পিছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে। কিন্তু কেন? পাসপোর্ট যখন আটকে দেয়া গেছে তখন মিসেস অরুণা চ্যাটার্জী যে দেশের বাইরে যেতে পারছেন না সেটা নিশ্চিত। তাহলে কি ওরা সবাই আশা করছে গোপনে অনিল দেখা করবে ওঁর সঙ্গে? কি হয়েছে অনিলের? ধরা পড়েছে কারও হাতে, নাকি আনুগত্য পরিবর্তন করেছে? কার্ডটার কথা ভাবল রানা–আটকে গেছি, ছুটতে পারছি না। শরীরটাও খারাপ। এর মানে কি? হয় বন্দী হয়েছে, নয় লুকিয়ে আছে কোথাও ভেনিসের কাছাকাছি। খুব সম্ভব আহত অবস্থায়। অথচ ভারতীয় এমব্যাসীতে গিয়ে উঠতে পারছে না সাহায্যের জন্যে। রানার কাছে সাহায্য চাওয়া যায়, কিন্তু তার নিজের দেশের সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়া যায় না। কেন?

নানান কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এল রানা হোটেলে। ঘরে ঢুকেই থমকে গেল রানা। একটা সোফায় বসে পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে বসে সিগারেট ফুঁকছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার শ্রীমান হাত-কাটা সোহেল। রানা থমকে দাঁড়াতেই এক চোখ বন্ধ করে সিগারেটটা ধরল সে রানার বুক লক্ষ্য করে।

'হ্যান্ডস্ আপ। এক চুল নড়লেই তোমার মাথার খুলি...' রানাকে তেড়ে আসতে দেখে এক লাফে সোফাটা ডিঙিয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়াল। চোখমুখ পাকিয়ে সিগারেটটা ধরে রেখেছে সে এখনও রানার বুকের দিকে। 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'তোর তাতে কি রে, শালা? তুই চোরের মত ঢুকেছিস কেন আমার ঘরে?'

'চোপরাও, ইতর কাঁহিকে। এটা তোর ঘর? জানিস তুই তোর সমস্ত হোটেলের বিল কাকে পে করতে হয়? এই বান্দাকে। এ ঘর আমার।'

'সে তো খুব ভাল কথা, তবে আর সোফার আড়ালে কেন? সামনে এসো না চাঁদ।'

'মারবি না তো?'

'ঠিক আছে, মাপ করে দিলাম। যা বলবার সংক্ষেপে বলে দূর হয়ে যা। কাজ আছে মেলা।'

আশ্বাস পেয়ে আবার সোফা টপকে এপারে চলে এল সোহেল। বসল দুজন। ইন্ডিয়া কিং-এর প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল সোহেল রানার দিকে। পুরো প্যাকেটটাই মেরে দেবার ইচ্ছে ছিল রানার, কিন্তু খুলে দেখল মাত্র একটা সিগারেট রয়েছে ওর মধ্যে। রানাকে নিরাশ হতে দেখে হাসল সোহেল, আঙুল দিয়ে দেখাল নিজের ফুলে থাকা বুক পকেট। আগেই সব সিগারেট বের করে পকেটে রেখেছে সে। রানা সিগারেট ধরিয়ে নিতেই কাজের কথায় এল সোহেল।

'আমাকে পাঠানো হয়েছে তোর বস্ হিসেবে তোকে একটু ধমক-ধামক দেয়ার জন্যে। আজকের ফ্লাইট ক্যান্সেল করলি কেন? নিজের কাজ ফেলে কি গোলমাল পাকাতে শুরু করেছিস তুই এখানে বল্ তো?'

'কি করেছি?'

'এমন একটা ব্যাপারে অনর্থক নিজেকে জড়াতে যাচ্ছিস যার সঙ্গে তোর বা বাংলাদেশের কোন সম্পর্ক নেই। তোকে সাবধান করে দেয়ার হুকুম হয়েছে আমার ওপর।'

'তাই নাকি?' ধীরে সুস্থে ধরাল রানা সিগারেটটা। 'তা কে পাঠাল তোকে?'

'বুড়ো।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কি বললি?'

'বুড়ো।' একই সুরে পুনরাবৃত্তি করল সোহেল। 'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান। এইবার ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করা গেছে?' একটু থেমে আর একটু ব্যাখ্যা করল সোহেল। 'আমি এসব কিছুই জানি না, সন্ধ্যার ফ্লাইটে দিল্লী যাওয়ার কথা, হঠাৎ আধঘণ্টা আগে বড় সাহেবের মেসেজ এল। খুব সম্ভব রঞ্জন চৌধুরী যোগাযোগ করেছিল ঢাকায় বড় সাহেবের সঙ্গে। ওদের ধারণা তুই অনর্থক তোর নোংরা নাক গলাচ্ছিস ওদের ঘরোয়া ব্যাপারে। বিরক্তিকর মাছির মত ভনভন করছিস ওদের চারপাশে। ওরা চায় তুই যেন তোর দামী মাথাটা অন্যখানে গিয়ে ঘামাস।'

হাসির ভঙ্গি করল রানা। 'ঠাট্টা করছিস?'

'তোর ভগ্নিপতি হিসেবে সে রাইট আমার আছে, কিন্তু ঠাট্টা নয় দোস্ত, প্রয়োজন হলে গাঁট্টা চালাবে এরা। অত্যন্ত সিরিয়াস ব্যাপার।' কথাগুলো বলতে বলতেই টের পেল সোহেল ক্রমে কঠোর হয়ে যাচ্ছে রানার চোখ-মুখ। বিপদসংকেত টের পেয়ে চট করে যোগ করল, 'দ্যাখ, রানা, তুই ভাল করেই জানিস, তোকে বিরত করবার উপায় নেই। কিন্তু দুই দেশের সম্পর্কের কথাটাও তো ভাবতে হবে। আমার যা মনে হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে প্যাঁচ আছে, খুবই উঁচু লেভেলের ব্যাপার। এ ব্যাপারে তোর আগ্রহ দেখে এরা ভয়ানক ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে—ঠিক ভীমরুলের

চাকে ঢিল পড়ার মত অবস্থা ।’

‘কোন্ ব্যাপারে আমার এত আগ্রহ দেখতে পাচ্ছে এরা?’ যেন রীতিমত অবাক হয়ে গেছে এমনি ভাব করল রানা। বুঝতে পেরেছে সে, এখন ভান না করলে কথা আদায় করা যাবে না সোহেলের কাছ থেকে ।

বার কয়েক চোখ মিটমিট করল সোহেল ।

‘তুই জানিস না কোন্ ব্যাপারে কথা হচ্ছে?’

‘অনিল বলে একটা ছেলেকে চিনি। তার মা এসেছিলেন আজ। ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। কথা দিয়েছি সম্ভব হলে খোঁজ করে বের করবার চেষ্টা করব ওকে। ব্যস, এই। কেন যে এতে রঞ্জন চৌধুরী বা মেজর জেনারেলের এত হাঁসফাঁসানি শুরু হয়ে গেছে বুঝতে পারছি না ।’

‘তোর জানা নেই যে অনিল চ্যাটার্জী সিক্রেট সার্ভিসের লোক?’

‘তাতে কি এসে গেল? সিক্রেট সার্ভিসের লোক বিপদে পড়ে না? টোকিয়ো থেকে তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসিনি একবার?’

‘আমি দেশদ্রোহী ছিলাম না।’ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সোহেল রানার চোখের দিকে ।

‘অনিল চ্যাটার্জী দেশদ্রোহী?’

‘তা আমি জানি না। সব কথা আমাকে ভেঙে বলার প্রয়োজন বোধ করেননি মেজর জেনারেল। তবে যেটুকু আঁচ করছি, চৌধুরী তাঁকে তাই বুঝিয়েছে। খুব সম্ভব ধরা পড়েছে সে কোন ইন্টারেস্টেড পার্টির হাতে। অথবা যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে স্বেচ্ছায়। চৌধুরীর কাছে দুটোই সমান। অনেক গোপন তথ্য বেরিয়ে পড়বে অনিল মুখ খুললে। আমার বিশ্বাস মুখ খুলেছে অনিল ।’

খানিক চুপচাপ সিগারেট টানল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল,

'অতএব?'

'অতএব বুঝতেই পারছ। তোমার উবগারের উৎসাহ একটু দমন করতে হবে। এটা অফিশিয়াল অর্ডার। যদি ভায়োলেট করো, নিজ দায়িত্বে করবে। আর বিদেশে যদি কোন বিপদে পড়ো, দৌড়ে গিয়ে যে এমব্যাসীতে উঠবে, সেটা চলবে না। ইটালির কোথাও বাংলাদেশ বা ভারতীয় এমব্যাসীতে আশ্রয় মিলবে না তোমার।'

উঠে দাঁড়াল সোহেল। হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

'কি জানাব বুড়ো মিঞাকে? কবুল?'

'জানিয়ে দিস, ভেবে দেখব আমি। এটাও বলিস, এক অসহায় মা সাহায্য চেয়েছিল রানার কাছে তার সন্তানের মহা বিপদের সময়।'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু চেয়ে রইল পরস্পরের চোখের দিকে। ইস্পাতের মত দৃঢ় দুই পুরুষ। মেজর জেনারেল রাহাত খানের নিজ হাতের গড়া বাংলাদেশের দুই সোনার টুকরো। সোহেলের ডান চোখটা সামান্য একটু ছোট হয়েই আবার সমান হয়ে গেল। হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোল সোহেল লম্বা পা ফেলে। কোটের একটা হাত দুলছে কেবল, আরেকটা হাত ঝুলে আছে স্থির হয়ে।

ছোট্ট একটা ভাড়াটে বাড়ি, পশুপতি বসু লেনের শেষ মাথায়। সন্ধের একটু আগে পৌঁছল রানা। ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলেই রানাকে দেখে মধুর হাসি ফুটে উঠল মায়ের মুখে।

'এসো বাবা, এসো, ভেতরে এসো।'

সাদামাঠা একটা ড্রইং-রুমে রানাকে বসিয়ে এক্ষুণি কাজটা

সেরে আসছি বলে চলে গেলেন ঠাকুর ঘরের দিকে। রানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ঘরটা, দেয়ালে ঝোলানো অনিলের বাবার ছবি, বুকশেল্‌ফ্‌ ভর্তি বিপ্লবাত্মক বই, খটখটে টেবিল-চেয়ার, সবকিছুতেই মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাপ। রাজনৈতিক চেতনা এবং আদর্শবাদের ছাপও টের পেল রানা।

বৃদ্ধা এসে বসলেন। মনে মনে গুছিয়ে নিল রানা।

'তেমন কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারিনি, কিন্তু কয়েকটা তথ্য জানতে পেরেছি। ঠিক কতটা আপনাকে বলা উচিত বুঝতে পারছি না।'

'আমি সহ্য করতে পারব, বাবা। যা জেনেছ বিনা দ্বিধায় বলতে পারো।'

রানা বুঝল মনটা শক্ত করে নিয়ে বসলেন বৃদ্ধা ঋজু ভঙ্গিতে। ভরসা পেল। শুরু করল, 'কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলাম, ও গুপ্তচর বিভাগের কর্মচারী হিসেবেই গিয়েছিল রোমে। এবং একটা কিছু অঘটন ঘটেছে।'

চোখ বুজে এক সেকেন্ড টিপে রেখে আবার খুললেন বৃদ্ধা। 'সত্যিই তাহলে বিপদের মধ্যে আছে অনিল। ধরা পড়েছে, তাই না?'

একটু ইতস্তত করে রানা বলল, 'সেটা কেউ বলতে রাজি নয়। তবে আমার মনে হয় ধরা পড়েনি ও। ধরা পড়লে কার্ডটা পাঠাতে পারত না। কিন্তু কার্ডটা নকলও হতে পারে, কিংবা ওকে দিয়ে জোর করে লেখানো হয়ে থাকতে পারে আমাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে। যদি কার্ডটা নকল না হয়, কিংবা গায়ের জোরে লেখানো না হয়ে থাকে তাহলে আমার বিশ্বাস এখনও মুক্ত আছে ও, খুব সম্ভব লুকিয়ে আছে কোথাও।'

'এরা কোনরকম সাহায্য করবে না অনিলকে?' নিজের হাতের দিকে চেয়ে বললেন বৃদ্ধা।

'মনে হয় না। আমিও যেন কোনরকম সাহায্য করতে না পরি, সেজন্যে অনিলের ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে দেখেই এরা ঢাকায় আমার হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছে। আমার ওপর হুকুম হয়েছে যেন নিজের কাজ সেরে ফিরে আসি। যেন অনিলের ব্যাপারে নাক না গলাই।'

'এ রকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে? আমার পিছনেও পুলিস লাগানো হয়েছে। তোমার কি মনে হয় অনিল এদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?'

'আমি আপনার কাছে এসেছি আজ বিশেষ করে এই কথাটাই জানাবার জন্যে।' সরাসরি চাইল রানা বৃদ্ধার মুখের দিকে। 'অনিলকে আমার চেয়ে অনেক ভাল করে চেনেন আপনি। আপনার কি মনে হয় ওর দ্বারা একাজ করা সম্ভব?'

থমকে গেলেন বৃদ্ধা কয়েক সেকেন্ড।

'বড় কঠিন প্রশ্ন করলে, বাবা। কোন মাকে তার নিজের ছেলের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করতে নেই। তবু তুমি যখন জানতে চাইছ, আমি সততার সাথে তোমার এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করব।' খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন বৃদ্ধা মাথা নিচু করে, তারপর চাইলেন রানার চোখে। 'না। একাজ অনিলের পক্ষে অসম্ভব। ও যে পরিবারের ছেলে, যে আদর্শের ছত্রছায়ায় মানুষ হয়েছে, কখনোই ও একাজ করতে পারে না।'

মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। 'আপনি বাঁচালেন আমাকে। কথা যখন দিয়েছিলাম, আমার সাধ্যমত করতে আমাকে হতই। কিন্তু এখন জানলাম, আমি অন্যায় কিছু করছি না, সত্যের জন্যেই কাজ করছি। দ্বিধা রইল না আর।'

'আমার কথা বিশ্বাস করলে তুমি?'

'নিশ্চয়ই।'

'এরা বাধা দেবে তোমাকে, সাহায্য করতে চাইলে। তাছাড়া

তোমার হেড আপিসের হুকুম...’

‘অমান্য করব।’ হাসল রানা। ‘আমাকে আমার অফিস সে লাইসেন্স দিয়েছে। ওদিক থেকে কোন অসুবিধে হবে না।’

‘এদিক থেকে?’

‘হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। আগে থেকে কিছুই বলা যাচ্ছে না। যা হয় হবে।’

‘ভারতের হয়ে অনিল যে কাজ করত, তুমি কি বাংলাদেশের হয়ে সেই কাজই করো, বাবা?’

একটু থমকে গেল রানা। তারপর হাসল।

‘অনেকটা। হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?’

‘সেজন্যেই তোমার সাহায্য চেয়েছিল অনিল। বুঝতে পারছি। কাজটা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাও বুঝতে পারছি। হঠাৎ মনে হচ্ছে, স্বার্থপরের মত কাজ করছি না তো আমি? নিজের ছেলেকে সাহায্য করার জন্যে আরেকজনের ছেলেকে অনুরোধ করছি বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে, সেটা কি উচিত হচ্ছে? আমার কাছে অনিল যতটা মূল্যবান, তোমার মায়ের কাছে তুমি তার চেয়ে কোন অংশে কম মূল্যবান নও, বাবা।’

হেসে ফেলল রানা। ‘ও, এই কথা? এ নিয়ে কিচ্ছু ভাববেন না আপনি। আমার মা-ই নেই, তার আবার মূল্য! কোন মূল্য নেই আমার।’

রানার হাসি মুখের দিকে চেয়ে হাসি হাসি হয়ে উঠেছিল বৃদ্ধার মুখটাও, কথা শুনে মিলিয়ে গেল হাসিটা। অদ্ভুত একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বেপরোয়া ছেলেটার দিকে। কথা বলেই চলল রানা।

‘অনিলের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ রয়েছে এদের হাতে জানা নেই আমার। কেউ কোন কথা বলছে না। সব জায়গাতেই ঢাক ঢাক গুড় গুড়। এখন একমাত্র উপায় দেখছি ভেনিসে গিয়ে খোঁজ খবর

করা। কাল রওনা হচ্ছি আমি ভিয়েনার উদ্দেশ্যে। ঠিক তিনদিন পর পৌঁছব ভেনিসে। ওখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ খবর শুরু করব আমি। ওখানে ওর পরিচিতদের দু'একজনের নাম বলতে পারবেন?'

খানিক চিন্তা করে বললেন বৃদ্ধা, 'ঠিক মনে তো পড়ছে না, বাবা। একটু বসো, আমি অনিলের কয়েকটা চিঠি নিয়ে আসি। জুলি মাযিনি বলে একটা মেয়ের কথা প্রায় চিঠিতেই লিখত। আসছি।'

চিঠিগুলি ঘেঁটে জানা গেল সান মার্কোর কাছে একটা গ্লাসফ্যাক্টরিতে কাজ করে মেয়েটা। মালিকের নাম গিয়াকোমো পাসেল্লী। ওখানে যাতায়াত ছিল অনিলের। আঁচ করা গেল মেয়েটার ব্যাপারে কিছুটা দুর্বলতাও হয়তো ছিল। আরও জানা গেল ভেনিসে গেলে মডার্নো হোটেলে উঠত সে। রিয়াল্টো ব্রিজের কাছাকাছি কোথাও হোটেলটা। এছাড়া আর বিশেষ কিছুই নেই চিঠিতে।

'আচ্ছা, বছর খানেকের মধ্যে তোলা অনিলের একটা ছবি দিতে পারবেন?'

'আছে।'

উঠতে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধা, রানা বলল, 'আর একটা কথা, ইচ্ছে করলে ছেলেকে একটা চিঠি দিতে পারেন। ওকে যদি খুঁজে পাই, আপনার লেখা একটা চিঠি পেলে খুবই ভাল লাগবে ওর।'

টলমল করে উঠল বৃদ্ধার চোখ দুটো, কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন সামলে নিয়ে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'বড় ভাল ছেলে তুমি, বাবা। সমুদ্রের মত বিরাট তোমার মনটা। ধন্য তোমার স্বর্গবাসিনী মা!'

দশ মিনিট পর চিঠি আর ফটোগ্রাফ পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল রানা। মৃদু হেসে বিদায় নিল। কিছুটা হেঁটে বাগবাজার স্ট্রীটে উঠে ট্যাক্সি নিল। ড্রাইভারকে বলল, 'সোজা চলো কন্টিনেন্টাল

হোটেলে।’

রঞ্জন চৌধুরীর কথাগুলো মনে এল রানার। নিজের পায়ে কুড়োল মেরেছে অনিল। এখন আর কারও কিছুই করবার নেই। অনিল যা করেছে সেটা করার আগে তার একবার মায়ের কথা ভাবা উচিত ছিল।

কি করেছে অনিল?

চার

সান ম্যারিয়া ডি লা স্যালুটের গম্বুজের পেছনে ডুবে যাচ্ছে সূর্যটা। গ্র্যান্ড ক্যানেলের নীলাভ জলে হাল্‌কা গোলাপী আলোর ঝিলিমিলি। অপূর্ব।

একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবছে রানা। ভেনিসে পৌঁছেই টের পেয়েছে সে, কি অসম্ভব দুঃসাধ্য কাজে হাত দিয়েছে সে এবার। একটা ফটোগ্রাফ, একটা মেয়ের নাম, একজন কাঁচ ব্যবসায়ীর নাম, আর একটা হোটেলের ঠিকানা—এই রানার সম্বল। গিজগিজ ট্যুরিস্টে ঠাসা এই বন্দর নগরীতে এত সামান্য তথ্যের ভিত্তিতে কাউকে খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার চেয়েও দুঃসাধ্য। সে সুঁই যদি ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় তাহলে তো আরও।

যাই হোক, কাজ শুরু করে দিলে দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে গ্লাস ফ্যাক্টরিতেই যাবে বলে ঠিক করেছে রানা। মেয়েটাকে পেলে তার কাছ থেকে হয়তো কিছু জানা যাবে।

দুই হাতে দু’কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল গিলটি মিঞা। রানার হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিয়ে ফড়াৎ করে চুমুক দিল নিজের কাপে।

‘শহরটা নেহাত মন্দ নয়, কি বলেন, স্যার? অবশ্য ক্যালক্যাটার পায়ের কাচেও লাগে না। একটু পয়-পরিষ্কার, এই যা। মানুষগুনোও ফর্সা। তবে লাজলজ্জার বালাই নেই, রাস্তায় ডেঁড়িয়ে ব্যাটাছেলে মেয়েছেলেতে চুমু খায়। বিচ্ছিরি কারবার!’

‘এই দুদিন খাওয়া-দাওয়া কোথায় করেছ?’

‘উই উদিকের এক হোটেলে। ছোঃ! এক্কেবারে যাতা। মুকে দোয়া যায় না। বললুম একপ্লেট গরম ভাত আর একবাটি সর্ষেইলিশ লিয়ে এসো—পরিষ্কার বাংলা কতা বোজে না শালারা, কি সব কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং লিয়ে এল। ওসব কি খাবার হলো? আশেপাশের টেবিলে দেকি তাই গিলচে সবাই গোগ্রাসে। ধরতে গেলে দুটো দিন প্রায় খালি পেটেই আচি স্যার, পানি খেয়ে ভরিয়ে রেকেচি পেটটা টই-টম্বুর করে। একটু নড়লেই ঢক-ঢক করে।’

‘শহরের গলিঘুঁজি সব চিনে নিয়েছ?’

‘চিনে লিয়েচি মানে? মুখস্ত করে লিয়েচি। যেখানে খুশি লিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিন না, গুট-গুট করে হেঁটে ফিরে আসব এই বাসায়। গাড়ি ঘোড়াও নেই যে চাপা পড়ে মারা যাব।’

ভিয়েনায় পৌঁছেই এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে রানা গিলটি মিঞাকে একটা ছোটখাট বাড়ি ভাড়া নিয়ে ঘুরে ফিরে শহরটা দেখে তৈরি হয়ে থাকার জন্যে। ওকে বিদেশে আনার আসল উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েনা সম্মেলনে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে সেটা দেখানো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বিভাগের নব আবিষ্কৃত আধুনিক কলাকৌশল ব্যাখ্যা করে দেখানোর কথা ছিল প্রদর্শনীতে। রানা-এজেন্সির প্রধান সহকারী হিসেবে এসব গিলটি মিঞার কাজে লাগবে মনে করে নিয়ে এসেছিল রানা ওকে সঙ্গে করে। এসব ছাড়াই অবশ্য আশ্চর্য প্রতিভা বলে কয়েকটা জটিল কেসের সমাধান করে গিলটি মিঞা

ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে ফেলেছে, তবু বিদেশের কলাকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে অনেক উপকার হত ওর, উৎসাহিতও হত—কিন্তু কি একটা গোলমাল বাধায় প্রদর্শনীর পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। তাই পাঠিয়ে দিয়েছে ওকে রানা ভেনিসে। বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষা জানা নেই গিলটি মিঞার, আকারে ইঙ্গিতে কিভাবে কি বুঝিয়েছে কে জানে, লাইবেরিয়া ভেচিয়ার কাছে গ্র্যান্ড ক্যানেলের ধারে স্যান জর্জিও দ্বীপপুঞ্জের দিকে মুখ করা চমৎকার একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে আছে সে এখানে। ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছেচে রানা, স্নান সেরে কাপড় পরে তৈরি হতে না হতেই চা করে এনেছে গিলটি মিঞা।

চা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখল রানা একটা টেবিলের ওপর।

'কোতাউ চললেন নাকি, স্যার?' রানাকে মাথা নেড়ে সায় দিতে দেখে বলল, 'তা খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্তা করা যায়? আপনি ওসব ছাইপাঁশ খাবেন, না দুটো চাল ফুটাব? সারা শহর ঘুরে খুঁজেপেতে বাজার করে এনেচি আজ।'

'ওসব থাক, আমি ঘুরে আসছি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। তারপর তোমাকে নিয়ে গিয়ে একটা হোটেলে বাঙালী খাওয়া খেয়ে আসব। ততক্ষণ ওই রাস্তার পাশে ফলের দোকান থেকে কিছু ফলমূল কিনে এনে খাও।'

বেরিয়ে পড়ল রানা। ভিড় ঠেলে এগোল পিয়াযা সান মার্কোর দিকে। ডি ফ্যাব্রি গলি দিয়ে শর্টকাট করল রানা রাস্তাটা। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পেয়ে গেল গিয়াকোমো পাসেল্লীর ফ্যাক্টরি। সরু লম্বা দোকানটা, ঝকমক করছে বিচিত্র ডিজাইনের অসংখ্য জিনিসপত্রে। পায়ে পায়ে ভিতরে ঢুকে এল রানা। ছাতে ঝুলছে সারি সারি ঝাড়বাতি, শো-কেসে রঙবেরঙের কাঁচের

আসবাব, খেলনা, পুতুল। বেশির ভাগই ঘর সাজাবার সরঞ্জাম। উজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক করছে পুরোটা দোকান।

দোকানের শেষের দিকে একটা লম্বা বেঞ্চে বসে কাজ করছে কালো ইউনিফরম পরা তিনজন মেয়ে কর্মচারী। তিনটে গ্যাসবার্নার জ্বলছে তিনজনের সামনে, রঙিন কাঁচের লম্বা রড আগুনে গলিয়ে চমৎকার ছোট ছোট জন্তু জানোয়ার তৈরি করছে ওরা ব্যস্ত হাতে। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ওদের দক্ষ হাতের দ্রুত কাজ দেখল রানা।

একটা মেয়ে চোখ তুলে দেখল রানাকে। কালো ডাগর দুই চোখ স্থির হয়ে রইল রানার চোখের ওপর তিন সেকেন্ড, তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে গেল কাজে। ক্যাঙারু তৈরি করছে মেয়েটা একটার পর একটা। হাতের ক্যাঙারুটা ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে নামিয়ে রেখে আবার চাইল মেয়েটা রানার চোখের দিকে। এই কি জুলি মাযিনি? প্রশ্ন করতে গিয়েও সতর্ক হয়ে গেল রানা। মেয়েটার চোখে কি সতর্কবাণী দেখতে পেল সে? ভুরু জোড়া একটু কাঁপল বলে মনে হলো না? দৃষ্টিটা সরে গেল। একটা লাল কাঁচের রড হাতে তুলে নিয়ে বার্নারের আগুনে নরম করল, তারপর আশ্চর্য ক্ষিপ্র হাতে ওটা বাঁকিয়ে একটা ডিজাইন তৈরি করল তিন সেকেন্ডের মধ্যে। ধক করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা, যখন দেখল বাঁকাচোরা ডিজাইনের ঠিক মাঝখানটায় পরিষ্কার বাংলা লেখা আছে—অনিল। একটা লতা এঁকেবেঁকে জড়িয়ে ধরে আছে প্রত্যেকটা শব্দকে, কিন্তু লেখাটা পড়তে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। দুই সেকেন্ড, তারপরই আগুনের ওপর একবার বুলিয়ে নিয়ে ওটাকে ক্যাঙারুতে পরিণত করল মেয়েটা দশ সেকেন্ডে। ব্যাপারটা এতই দ্রুত ঘটে গেল যে হঠাৎ রানার মনে হলো চোখের ধাঁধা নয়তো? ঠিকই দেখেছে সে অনিলের নাম?

যাই হোক, একটা ব্যাপার বুঝতে ভুল করল না রানা, মেয়েটাকে সে চিনতে পেরেছে এরকম কোন আভাস দেয়া চলবে না এখন।

'আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বরে চমকে গিয়ে পাশ ফিরল রানা। লম্বা একজন ইটালিয়ান। পিঠটা সামান্য কুঁজো, শরীরের ওপরের অংশটা ঝুঁকে আছে সামনে, তবু রানার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি বেশি লম্বা লোকটা। তেমনি চিকন। নাকটা চিলের চঞ্চুর মত বাঁকানো। সরু গোঁফ, তার নিচে ঝকঝক করছে সাদা দাঁত ব্যবসায়ীসুলভ বিনীত হাসিতে। 'কি চাই আপনার?'

'একটা ঝাড়বাতি কিনতে চাই।'

'বেশ তো, আসুন না এদিকে। কয়েক রকম ডিজাইন দেখাচ্ছি, যেটা পছন্দ হয় নেবেন।'

লোকটার সঙ্গে একটা ছোট্ট অফিসরুমে এসে ঢুকল রানা। রানাকে বসিয়ে একটা ডিজাইনের খাতা ওল্টাতে শুরু করল লোকটা ব্যস্ত হাতে।

'আপনিই কি সিনর গিয়াকোমো পাসেল্লী?'

থেমে গেল ব্যস্ত হাতটা। পরমুহূর্তে আবার চালু হলো।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার দোকানের সুনাম করেছে বুঝি কেউ?'

'হ্যাঁ। আমার এক বন্ধু। আপনারও বন্ধু।'

'তার নামটা, সিনর?' ঝাড়বাতির কয়েকটা ডিজাইন খাতা থেকে বের করে এগিয়ে ধরল গিয়াকোমো রানার দিকে হাসিমুখে।

রানার চোখ দুটো স্থির হলো গিয়াকোমোর মুখে। বলল, 'অনিল চ্যাটার্জী।'

একটু যেন চমকে উঠল লোকটা। হাসিটা জমে গেল বরফের মত। ভাবলেশহীন রক্তশূন্য মুখ। হাত থেকে খসে পড়ে গেল

কয়েকটা ডিজাইন। নিচু হয়ে ঝুঁকে তুলছে সে ওগুলো মাটি থেকে। অবাক হলো রানা লোকটার প্রতিক্রিয়া দেখে। অনিলের নাম শুনেই এমন আঁৎকে উঠল কেন লোকটা?

যখন সোজা হলো লোকটা তখন আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে মুখটা। ফিরে এসেছে প্র্যাকটিস করা হাসি। বলল, 'আচ্ছা! সেই ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক? হ্যাঁ। উনি আমাদের গুণগ্রাহীদের একজন। খুবই মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। তা বহুদিন ওঁর সঙ্গে দেখা নেই, আছেন কোথায় উনি?'

'এখন কোথায় আছেন জানি না। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বেশ কয়েক মাস আগে যখন ভারতে গিয়েছিলাম, তখন। ভেনিসে বেড়াতে আসব শুনে আপনার ঠিকানাটা দিলেন, বললেন উনিও এই সময়ের দিকে ভেনিসে থাকবেন, কিন্তু কোন্ ঠিকানায় থাকবেন সেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারব। আপনি জানেন না কোথায় আছেন উনি?'

'না তো!' রানা বুঝল পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলছে লোকটা। বলল, 'সিনর চ্যাটার্জী হয়তো প্ল্যান পরিবর্তন করেছেন, এমনও হতে পারে। আমার মনে হয় কয়েক মাসের মধ্যে ভেনিসে আসেননি উনি। বহুদিন দেখা নেই আমাদের।' হঠাৎ সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল লোকটা, 'আপনি কি ভারতীয় নন?'

'না। আমি বাংলাদেশের লোক।'

একটু যেন স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল গিয়াকোমোর মুখে। একটা ডিজাইন পছন্দ করল রানা, কোথায় পাঠিয়ে দিতে হবে সে ঠিকানা দিল, তারপর বেরিয়ে এল অফিস কামরা থেকে। পিছু পিছু এল লম্বা লোকটা।

থেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ওর তো আরও বন্ধুবান্ধব আছে ভেনিসে, তাদের দু'একজনের ঠিকানা দিতে পারবেন?'

মাথা নাড়ল গিয়াকোমো। 'এই দোকানে মাঝে মাঝে

আসতেন বলেই যা পরিচয়, অন্যান্য বন্ধুর কথা আমি কিছুই বলতে পারছি না। দুঃখিত।'

হেসে ফেলল রানা। 'না, না। অত দুঃখ পাওয়ার কি আছে? যদি এর মধ্যে এসে হাজির হয় তাহলে আমার ঠিকানাটা ওকে দিলে সুখী হব। হপ্তাখানেক আছি ভেনিসে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

রানা চেয়ে দেখল তেমনি ব্যস্ত ভাবে কাঁচের খেলনা তৈরি করে চলেছে ওরা তিনজন। কেউ মুখ তুলে চাইল না। ওদের দিকে ইঙ্গিত করে রানা বলল, 'বেশ রাত পর্যন্ত কাজ হয় বুঝি আপনার এখানে?'

'হ্যাঁ। সিজন চলছে কিনা, এগারোটার সময় বন্ধ করি আজকাল।'

'ও বাবা! অনেক রাত। তখন আমি হয়তো ফ্লোরিয়ানে ক্যাবারে দেখছি।' মেয়েটি যাতে শুনতে পায় সেজন্যে গলাটা একটু চড়িয়ে দিল রানা শেষের দিকে। 'আচ্ছা, চলি, আবার দেখা হবে।'

চোখ না তুলেই ছোট্ট করে একটু মাথাটা নাড়ল মেয়েটা। ইঙ্গিতটা এতই অস্পষ্ট যে ওর বক্তব্য বুঝতে পারল কিনা ভাল করে ঠাহর করতে পারল না রানা। গিয়াকোমোর প্রতি ছোট্ট একটা নড করে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

বিশেষ কিছুই জানা যায়নি, কিন্তু খেলার প্রথম চালটা দিয়েছে সে। দেখা যাক এখন কি হয়। মেয়েটার গোপনীয়তার মানে কি? গিয়াকোমো কি প্রতিপক্ষের লোক? ইচ্ছে করেই ওকে নিজের ঠিকানাটা দিয়ে এসেছে সে। এতে বিপদের আশঙ্কা আছে ঠিকই, কিন্তু দ্রুত কাজ সারতে হলে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে শত্রুপক্ষের সামনে, এছাড়া কোন উপায় নেই। রানা এক চাল দিয়েছে, এখন ওদের চালের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

মডার্নো হোটেলেও একটু খোঁজ খবর করে বাসায় ফিরবে ঠিক করল রানা। সেখানেও হয়তো যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে কারও সঙ্গে।

ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগোচ্ছে রানা। ফ্যাক্টরির দরজায় এসে দাঁড়াল গিয়াকোমো। কালো হ্যাট, কালো স্যুট পরা মোটাসোটা একজন বেঁটে লোককে আবছা একটা ইঙ্গিত করল সে। একটা দোকানের শো-কেসের সামনে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটছিল লোকটা, ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র চলতে শুরু করল রানার পিছু পিছু।

ফনডামেন্টার কাছে ক্যানালের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিল একজন সাদা স্যুট ও সাদা হ্যাট পরা একহারা, লম্বা লোক। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বুড়ো আঙুল দিয়ে রানাকে দেখাল বেঁটে লোকটা। তন্দ্রালু দৃষ্টিতে দেখল লোকটা রানাকে, তারপর আড়মোড়া ভেঙে হাঁটতে থাকল পিছন পিছন।

এসবের কিছুই টের পেল না রানা। উদ্বিগ্ন চিত্তে হাঁটছে সে মর্ডানো হোটেলের দিকে।

পাঁচ

এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটে পৌঁছল রানা ফ্লোরিয়ানে। এত রাতেও লোকজনের কমতি নেই। জায়গা পাওয়া মুশকিল। তার ওপর ক্যাবারে দেখতে গেলে একেবারে ভিতরে ঢুকতে হয়, ওখান থেকে চত্বরের দিকে লক্ষ রাখা যাবে না।

ঘুরে ফিরে দেখে কাফেতে একটা খালি টেবিল পেয়ে বসে পড়ল রানা। ক্যাবারের বাজনা ভেসে আসছে কানে, বিচিত্র সব ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে দেশ-বিদেশের ট্যুরিস্টরা, দূর থেকে স্টীমার আর লঞ্চের ভেঁপু ভেসে আসছে মাঝে মাঝে

এইসব বিশৃঙ্খল শব্দ ছাপিয়ে। সবটা মিলিয়ে এক মহা জগাখিচুড়ি। এক পেগ ব্র্যান্ডির অর্ডার দিয়ে টেবিলের নিচ দিয়ে লম্বা করল রানা পা দুটো। সিগারেট ধরাল একটা।

মর্ডানো হোটেলে কিছুই জানা যায়নি। অনিলকে চিনতে পারল ম্যানেজার, কিন্তু কোন খোঁজ দিতে পারল না ওর। এ-ও বলল, ভেনিসে এলে ওর হোটেল ছাড়া কোথাও উঠবে না অনিল চ্যাটার্জী–যখন উঠেনি, তার মানে সে ভেনিসে আসেনি।

অথচ রানা জানে ভেনিসেই আছে অনিল। কার্ড জাল হলে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু ওটা জাল নয় বলেই ওর ধারণা। তাই যদি হবে তাহলে সরাসরি অরুণা চ্যাটার্জীর ঠিকানায় পাঠানো হলো না কেন সেটা? কেন মামা বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হলো এস.ও.এস? কেন রানার সাহায্য চাওয়া হলো?

যাই হোক, সবকিছু নির্ভর করছে এখন এই কাঁচ ফ্যাক্টরির মেয়েটার ওপর। মেয়েটা যদি আসে, এসে পৌঁছলেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাইরে পিয়াযার দিকে চেয়ে খুঁজল রানা মেয়েটাকে জনারণ্যে। বুঝতে পারল এই ভিড়ে মেয়েটাকে খুঁজে বের করা ওর পক্ষে অসম্ভব। ওকেই খুঁজে নিতে হবে মেয়েটার। ক্যাবারের কথা বলে এসেছে সে, সেখানে ঢোকার মুখে পাহারায় বসে আছে সে দারোয়ানের মত। এখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই ওর।

পাশের টেবিল ছেড়ে উঠে গেল একজন গর্দান মোটা বেঁটে লোক বিল চুকিয়ে দিয়ে।

সাদা স্যুট ও সাদা হ্যাট পরা একজন লম্বা লোক একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বসল খালি টেবিলটায়। এক পেগ হুইস্কি অর্ডার দিয়ে সান্ধ্য পত্রিকা মেলে ধরল সামনে অলস ভঙ্গিতে।

ভুরু জোরা সামান্য কুঁচকে গেল রানার। মর্ডানো হোটেল

থেকে বেরোবার সময় লোকটাকে দেখেছে না সে? হঠাৎ মনে পড়ল গিলটি মিঞাকে নিয়ে খাওয়া সেরে বাসায় ফিরবার সময়ও একটা ব্রিজের ওপর দেখেছে সে লোকটাকে এক নজর। এখানেও সেই একই লোক। ব্যাপার কি? অনুসরণ করছে? চেহারাটা একটু ভাল করে দেখে রাখা দরকার। সামান্য একটু কাত হয়ে বসল রানা যাতে অলক্ষ্যে লক্ষ্য করা যায় লোকটাকে।

লম্বা একহারা চেহারা, কিন্তু এক নজরেই বুঝল রানা প্রয়োজনের সময় দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারে এই লোকটা। একেবারে পেটা শরীর। শক্ত চোয়াল, ধূর্ত চোখ। হাতের কব্জি দেখলেই বোঝা যায় অসুরের শক্তি আছে লোকটার গায়ে। সেই সঙ্গে রয়েছে চিতাবাঘের দ্রুততা।

সতর্ক হয়ে গেল রানা। কড়া মাল। বেকায়দা অবস্থায় এর হাতে পড়লে দুঃখ আছে কপালে।

পিয়াযার দিকে চোখ বুলাল রানা আবার। ঘড়ি দেখল। সোয়া এগারোটা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই অর্ধেক পথ এসে গেছে মেয়েটা। পৌঁছে যাবে সাড়ে এগারোটার মধ্যেই। ফরমোজা গলি দিয়ে যদি শর্টকাট করে তাহলে পৌঁছবে পাঁচ মিনিট আগেই।

সাদা হ্যাট পরা লোকটা একবারও চাইল না রানার দিকে। একেবারে ডুবে আছে খবরের কাগজে। সন্দেহটা অমূলক কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আসতে শুরু করল রানার মধ্যে। মিছেমিছিই অতি সতর্ক হতে যাচ্ছে সে? হতে পারে আজ সন্ধ্যে থেকে বারতিনেক দেখেছে সে এই লোকটাকে অথবা এর মতই অন্য কোন লোককে। তাতে কি? একটা লোককে তিনবার দেখলেই ভয় পাওয়ার কি আছে? হয়তো ওই লোকটাও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে ইতিমধ্যে রানাকে, তাই অত মনোযোগ দিয়ে পড়ছে খবরের কাগজ, ভাবছে, সন্ধ্যে থেকে তিন-তিন বার দেখা হলো কেন এই ব্যাটার সঙ্গে, গুণ্ডা বদমাশ নয়তো?

যাই হোক, সাবধানের মার নেই। ঠিক এগারোটা পঁচিশ মিনিটে বিলের জন্যে ডাকল রানা বেয়ারাকে। বিল এবং টিপ্‌স্ দিয়ে সহজ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।

রানার এই উত্থানে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না লোকটা। বেয়ারার দিকে চেয়ে খালি গ্লাসটা নাড়ল, আর এক পেগ হুইস্কির অর্ডার দিল।

ঠাসাঠাসি করে রাখা টেবিল চেয়ারের গায়ে ধাক্কা না দিয়ে অতি সাবধানে বেরিয়ে এল রানা কাফে থেকে এঁকেবেঁকে। বাইরে বেরিয়ে একটা থামের আড়ালে এমন ভাবে দাঁড়াল যেন কাঁচের জানালা দিয়ে সাদা হ্যাট পরা লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।

ভ্রূক্ষেপও করল না লোকটা। একবার চেয়েও দেখল না কোন্ দিকে গেল রানা। এমন মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে যে মনে হয় এটাই তার একমাত্র নেশা ও পেশা, এরই ওপর নির্ভর করছে ওর জীবন-মরণ। সন্দেহ প্রশমিত হলো রানার।

বেশ কিছুটা দূরে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে রানার দিকে চেয়ে রয়েছে একজন কালো হ্যাট, কালো স্যুট পরা মোটাসোটা বেঁটে লোক।

রানার দৃষ্টিটা ছুটে বেড়াচ্ছে পিয়াযার জনারণ্যের ওপর।

হতাশ হয়ে পড়তে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় দেখতে পেল মেয়েটাকে। একটা আলোকিত দোকানের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা রানার দিকে চেয়ে। সেই কালো ইউনিফর্মটাই পরে আছে, কিন্তু মাথায় একটা স্কার্ফ এমন ভাবে জড়িয়েছে যেন মুখের খানিকটা অংশ ঢাকা পড়ে। তবু চিনতে কষ্ট হলো না রানার, এ মেয়ে সেই মেয়েই। ফিগারটা দেখে মনে মনে অনিলের রুচির প্রশংসা না করে পারল না সে।

ভিড় ঠেলে এগোতে শুরু করল রানা। বেশ কিছুদূর এগিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাল। যেন ওর গতিবিধির প্রতি কোন

লক্ষই নেই লোকটার, তেমনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ডুবে আছে খবরের কাগজে। সন্দেহটা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল ওর।

বেঁটে লোকটাও দেখতে পেল মেয়েটাকে। একটু ঘুরে রওয়ানা হলো সে মেয়েটার দিকে। যেদিকটায় ভিড় কম সেদিকটা বেছে নিয়েছে সে, ফলে সে যে মেয়েটার দিকে এগোচ্ছে সেটা বোঝার উপায় নেই, তার ওপর ভিড় হালকা বলে রানার আগেই পৌঁছে যেতে পারবে সে মেয়েটার পেছনে।

এক মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা। রানা ত্রিশ গজের মধ্যে এসে পড়তেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মার্সেরিয়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

রানা চলল পেছন পেছন।

বেঁটে মোটা লোকটা কমিয়ে দিল চলার গতি। রানার থেকে বেশ কিছুটা ডাইনে এবং কয়েক হাত পেছনে চলল সে।

খবরের কাগজের আড়াল থেকে দেখল লম্বা লোকটা, চলে যাচ্ছে রানা। বিল চুকিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কাফে থেকে বেরিয়েই আঁচ করে নিল সে, কোন্দিকে চলেছে রানা। পেছনে পেছনে অনুসরণ না করে সোজা বাঁ দিকে রওয়ানা হলো, যাতে ঠিক সময় মত ওদের কাছাকাছি পড়া যায় বড় রাস্তায়।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা মেয়েটাকে। একবারও পিছু ফিরে না চেয়ে হেঁটে চলেছে মেয়েটা। রানা ওকে ওভারটেক করবার চেষ্টা করল না। মেয়েটার সমান গতিতেই এগোচ্ছে সে। কারণ মেয়েটা ইচ্ছে করলেই থেমে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারে, তা যখন করছে না তখন নিশ্চয়ই সে চায় না, রানার সঙ্গে তার এই ব্যস্ত রাজপথে দেখা হোক। যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে যাওয়াই ভাল।

আলোকোজ্জ্বল দোকান-পাটগুলো ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়েই ডানদিকে একটা প্রায়ান্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ল মেয়েটা। ঢুকে

পড়ল রানাও। বেশ কিছুদূর গিয়ে ঝট্ করে পেছনে ফিরল রানা একবার। কিন্তু তার আগেই সরে গেছে মোটা লোকটা একটা দেয়ালের আড়ালে। কান পেতে রানার পায়ের শব্দ শুনছে সে।

রানা বাঁয়ে মোড় নিতেই সাদা হ্যাট পরা লোকটা এগিয়ে এল।

'ওইদিক দিয়ে ঘুরে যাও তুমি,' বলল মোটা লোকটা। 'আমি যাচ্ছি পেছনে পেছনে।'

নিঃশব্দ পায়ে দৌড় দিল দু'জন দু'দিকে। সাদা হ্যাট পরা লোকটা রানা যে পথে চলেছে তার সমান্তরাল একটা গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল, ওদেরকে সামনে থেকে ধরার জন্যে।

মোড় নিয়েই দেখল রানা, গলিটা জনশূন্য। কেউ অনুসরণ করলে দূর থেকেই দেখা যাবে তাকে। বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে পদক্ষেপ দ্রুততর করল সে। ততক্ষণে আরেকটা মোড় ঘুরেছে মেয়েটা।

এই মোড়টা ঘুরেই দেখতে পেল রানা, কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা ওর জন্যে।

'কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা জানতে পারি?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'মাসুদ রানা।' থেমে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল রানা। আপনি কে? জুলি মাযিনি?'

'হ্যাঁ।' অবাক হলো মেয়েটা সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের মুখে নিজের নাম শুনে। এদিক ওদিক চাইল। 'কেউ অনুসরণ করছে না তো আপনাকে, সিনর মাসুদ রানা?'

সাদা হ্যাট পরা লোকটার কথা মনে পড়ল রানার। একটু ইতস্তত করে বলল, 'মনে হয় না। অনিলের কি খবর? কোথায় আছে ও?'

'ভয়ানক বিপদের মধ্যে আছে অনিল। পাগলের মত খুঁজছে

ওরা ওকে। আপনাকেও খুব সাবধানে...'

'কারা?' প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কারা খুঁজছে ওকে?'

চট্ করে রানার হাত ধরল মেয়েটা। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখটা।

'শুনতে পাচ্ছেন!'

কান খাড়া করল রানা। দ্রুত হালকা পায়ের শব্দ। যে গলিটা ছেড়ে ওরা এই গলিতে ঢুকেছে সেই গলিপথ ধরে এদিকে আসছে কেউ।

'আসছে!' চাপা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল মেয়েটা। 'কে যেন আসছে এদিকে!'

'ভয় নেই,' বলল রানা। 'কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অনিল কোথায়?'

'মনডোলো লেনের ৩৭ নম্বর...' আঁৎকে উঠে থেমে গেল জুলি। একজন কালো স্যুট পরা বেঁটেমত মোটা লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

রানার কব্জি খামচে ধরল মেয়েটা। বিবর্ণ মুখে একটা বাড়ির বারান্দার দিকে সরে গেল। রানাও সরল একটু লোকটাকে পথ করে দেয়ার জন্যে। গলিগুলো বড় বেশি সরু। ঢাকার তাঁতিবাজারকেও হার মানায়। রানা ভাবল, বহুদিনের পুরানো শহর বলেই হয়তো এ রকম।

কাছাকাছি এসেই হঠাৎ থেমে দাঁড়াল লোকটা। রানা প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সদ্য প্যাকেট থেকে বের করা একটা সিগারেট দেখাল লোকটা ওকে। 'কিছু মনে করবেন না, সিনর। ম্যাচ আছে আপনার কাছে?'

'আছে।' লোকটাকে যত শীঘ্রি সম্ভব ভাগাবার জন্যে চট্ করে পকেটে হাত দিল রানা।

বিদ্যুৎবেগে এক পা এগিয়ে এল লোকটা, রানার হাতটা বের করে আনার আগেই প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারল রানার পেটে।

মুহূর্তের মধ্যে পেটের পেশীগুলো শক্ত করে না নিলে এই এক ঘুসিতেই লিভার ফেটে মারা যেতে পারত রানা। ব্যথায় কুঁচকে গেল রানার চোখ-মুখ, সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। কিন্তু এক হাত পকেটে ভরা অবস্থাতেই দ্বিতীয় ঘুসি থেকে বাঁচার জন্যে ঝট্ করে মাথাটা সরিয়ে নিল সে একপাশে। থুতনি সই করে মারা ঘুসিটা চোয়ালে লেগে সাঁ করে বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে।

বাঁ হাতে ঘুসি মারল রানা একটা। ঘুসিটা লাগল লোকটার পাঁজরের নিচে ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল লোকটার মুখ দিয়ে। বেকায়দা অবস্থাতে চালানো রানার ঘুসির ওজন চমকে দিয়েছে ওকে। পিছিয়ে গেল এক পা। রানার ডান হাতটা বেরিয়ে আসছে কোটের পকেট থেকে, কাজেই আর কোন রকম সুযোগ না দেয়াই স্থির করল সে। দমাদম দুটো ঘুসি মারল রানার পাঁজরের উপর। এর কোন দরকার ছিল না, প্রথম ঘুসিতেই আসলে কাবু হয়ে গিয়েছিল রানা। টলটলায়মান অবস্থায় আরও দুটো ঘুসি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল রানা, তারপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। হাঁটুতে জোর নেই, ঠক-ঠক করে কাঁপছে পা দুটো। সেই অবস্থায় টের পেল পালিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা, দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে।

দড়াম করে পড়ল শেষ ঘুসিটা চোয়ালের ওপর। মাত্র ছ'ইঞ্চি দূর থেকে মারা ঘুসিটা খেয়ে বন্ করে ঘুরে উঠল রানার মাথা। একরাশ সর্ষেফুল দেখা গেল। ছিটকে গিয়ে ওপাশের দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেলো রানা, তারপর ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। এবং জ্ঞান হারাল।

একটা সুরেলা নারী কণ্ঠ শুনে জ্ঞান ফিরল রানার।

'মারা গেছে নাকি মানুষটা?'

রানা অনুভব করল তার শরীরটা নেড়েচেড়ে দেখছে কেউ। একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'না, জ্ঞান হারিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল রানা। মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ল বন্য জন্তুর মত। চোখ মেলল। দামী কাপড়-চোপড় পরা দুজন তরুণ-তরুণী। উদ্বিগ্ন দুজোড়া চোখ চেয়ে রয়েছে ওর মুখের দিকে। রানাকে চোখ মেলতে দেখে মনে হলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'দয়া করে নড়াচড়া করবেন না এখন। এক আধটা হাড়গোড় ভেঙে গিয়ে থাকতে পারে।' নরম গলায় বলল লোকটা।

'না। ঠিকই আছি।' উঠে বসল রানা। চোয়ালটাতে হাত বুলাল। পাকস্থলীতে কেমন যেন একটা চাপা ব্যথা অনুভব করছে সে। কপালের একপাশ ফুলে আছে, টের পেল হাত দিয়ে ছুঁয়ে। ডান হাতটা ওপরে তুলল সে। 'একটু সাহায্য করুন।'

চট্ করে রানার হাত ধরল মেয়েটা। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানাকে।

উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিতে খানিক সময় লাগল রানার। সারা শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে আবার ওর শক্তি। গলিটার এপাশ থেকে ওপাশ চোখ বুলাল রানা একবার। তারপর বলল, 'নাহ্, কিছু হয়নি। ঠিকই আছি।' হাত-পা ঝাড়া দিল। 'কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?'

'না। পথ হারিয়ে ঘুরছি আমরা। আপনার ওপর আর একটু হলে হুমড়ি খেয়েই পড়ছিলাম। সত্যিই ঠিক আছেন তো?'

'হ্যাঁ। কোন ভুল নেই তাতে। ধন্যবাদ।' পকেটে হাত দিল রানা। কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগটা গায়েব। নিজের ওপরই চটে গেল রানা। এতবড় ভুল করল সে কি করে? সেই মেয়েটার

কপালে কি ঘটল কে জানে!

'ছিনতাই হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'সেই রকমই মনে হচ্ছে।'

রাগে ফেটে পড়ল মেয়েটার সঙ্গী। 'আশ্চর্য এই ইটালিয়ানগুলো! সব গুণ্ডা বদমাইশ। এখান থেকে সরে পড়া দরকার। আমরা হোটেল গ্রিটিতে উঠেছি। ইনি আমার ছোট বোন, লুইসা পিয়েত্রো। আমার নাম সিলভিও পিয়েত্রো। আমাদের যদি হোটেলে পৌঁছে দেন তাহলে দু'পেগ ভালো ব্র্যান্ডি খাওয়াতে পারি।'

'আহ্, সিলভিও, নিশ্চয়ই ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। আগে খানিকটা বিশ্রাম দরকার ওর।'

'না, ঠিক আছি।' মেয়েটার দিকে ছোট্ট একটু বো করল রানা। 'আমার জন্যে ভাববেন না। কোন অসুবিধে নেই এখন আর। আপনাদের রাস্তা চিনিয়ে দেব আমি, কিন্তু চেহারার যে হাল হয়েছে, এই অবস্থায় এখন হোটেলে না যাওয়াই ভাল। আমি বাসায় ফিরব। আমার নাম মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা!' এক পা এগিয়ে এল মেয়েটা। রানার মুখটা পরখ করে দেখবার চেষ্টা করছে আবছা আলোয়। 'আমি তো চিনি আপনাকে! কোথায় যেন পরিচয় হয়েছিল আপনার সঙ্গে? ওমা, আজই তো আপনার সঙ্গে একই ট্রেনে ফিরলাম লিডো এয়ারপোর্ট থেকে। বান্ধবীকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। আপনার পাশের সীটেই বসেছিলাম আমি। চিনতে পারছেন?'

রানার মনে পড়ল অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ের পাশে বসে এসেছে সে লিডো থেকে ভেনিস। দু'এক টুকরো আলাপও হয়েছিল। কোন রকম ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেনি সে কাজে আসছে বলে, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করেছিল আশ্চর্য এক আমোঘ আকর্ষণে টানছে মেয়েটা ওকে। তাজা, উষ্ণ একটা আকর্ষণ আছে মেয়েটার

মধ্যে।

'চিনেছি এবার,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনারা কি ইটালিয়ান নন?'

'বাবা ইটালিয়ান, কিন্তু মা ফরাসী। আমরা ফ্রান্সে মানুষ হয়েছি।' হাসল মেয়েটা। 'নব্বই ভাগ ফরাসী, দশ ভাগ ইটালিয়ান আমরা।'

'চলুন, এগোনো যাক,' বলল রানা। দুটোকে ভাগানো দরকার। ওর মাথায় একমাত্র চিন্তা এখন জুলি মাযিনি। কি হলো মেয়েটার? ধরা পড়ল শত্রুপক্ষের হাতে, নাকি কিছুক্ষণ আগের ব্যাপারটা সত্যিই একটা ছিনতাইয়ের ঘটনা? অনিলের সঙ্গে কোন যোগ নেই এর? কোন্‌টা ঠিক জানতে হবে রানাকে। খুব শীঘ্রি। 'আপনাদের বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে যাই।'

উজ্জ্বল আলোয় এসে রানা দেখল, ভাই-বোনের প্রায় একই চেহারা। বোনের ওপর ভাইয়ের প্রভাব, না ভাইয়ের ওপর বোনের প্রভাব বোঝা গেল না। দুজনেই দেখতে ভাল। বাইশ থেকে সাতাশের মধ্যে বয়স। চকচকে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, মুখে কোমল একটা অমায়িক ভাব, সাজপোশাক সর্বাধুনিক, দামী।

হাত বাড়িয়ে দিল সিলভিও রানার দিকে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। ব্যাপারটা কি ঘটেছিল জানার জন্যে দারুণ কৌতূহল হচ্ছে। জানি জিজ্ঞেস করাটা অভদ্রতা, তাছাড়া এখন আপনার বিশ্রাম দরকার। পরে কোন একদিন যদি আপনার মুখে ঘটনাটা শুনতে পেতাম...'

'নিশ্চয়ই। আমি আছি আরও সাতদিন। এর মধ্যে একদিন আপনাদের হোটেলে গিয়ে শুনিয়ে আসব গল্পটা। ডেলা টলেটা বলে একটা প্যালাযোতে আছি আমি, স্যানসোভিনোর লাইবেরিয়া ভেচিয়ার কাছে। আপনারাও সময় পেলে একটা ফোন করে চলে আসতে পারেন যে কোন সময়। চলি এখন, কেমন?'

'আপনি দুর্দান্ত লোক, সিনর মাসুদ রানা,' বলল মেয়েটা।

‘চোয়ালে-কপালে যে দাগ দেখছি তাতে আঘাতের পরিমাণ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। এতবড় আঘাত হজম করাটা সোজা কথা নয়!’

বিনীত হাসি হাসল রানা। ‘ও কিছু নয়। অভিনয় করছি আসলে। বাসায় পৌঁছেই কান্নায় ভেঙে পড়ব। চলি, গুড বাই।’

দ্রুত পায়ে হেঁটে চলল রানা বাসার দিকে।

কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে দিল গিলটি মিঞা। অবাক হয়ে দেখল রানার বিধ্বস্ত চেহারা। এরকম মাঝেমধ্যে দেখে অভ্যাস আছে ওর। কোন প্রশ্ন করল না।

ঘরে ঢুকেই কাপড় ছাড়ল রানা প্রথমে। একটা নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট, গাঢ় কালচে-সবুজ রঙের শার্ট, আর কালো চামড়ার জ্যাকেট পরল। জুতো জোড়া বদলে রবার সোলের একজোড়া মোকাসিন পায়ে দিল। সুটকেসের গোপন একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরোল একটা ফল্‌স্‌ ঘড়ি—ঘড়ির মত কাঁটা-ডায়াল সবই আছে কিন্তু ভিতরে কোন যন্ত্রপাতি নেই। ব্যান্ডটা খুললেই ভারী একটা ধারাল অস্ত্রে পরিণত হবে সেটা। একটা খাপে পোরা স্টিলেটো বেঁধে নিল রানা ডান উরুতে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে। প্যান্টের পকেটের নিচ দিকটায় সেলাই নেই, হাত ঢুকিয়ে অনায়াসে বের করে আনা যায় ছুরিটা দরকারের সময়। তালা খোলার জন্যে বার্গলার্স কিট বের করে রাখল রানা হিপ পকেটে। বাঁ পকেটে রাখল একটা শক্তিশালী টর্চ, ইচ্ছে করলে এর রশ্মিকে ছোট করে দশ ফুট দূরে একটা সিকির সমান আলো ফেলা যায়। হাজার লিরার গোটা কয়েক নোট শার্টের বুক পকেটে রেখে খাটের ওপর বসল রানা। সিগারেট ধরাল।

ধরে নিতে হবে, বেঁটে বক্সারটা অনিলের শত্রুপক্ষের কেউ। সাধারণ চোর বা গুণ্ডা হতে পারে, কিন্তু সতর্কতার খাতিরে ওকে বিরুদ্ধ-পক্ষের কেউ বলে ধরে নেয়া উচিত। তাহলে কি জুলি

মাযিনির পরিচয় জেনে গেছে ওরা? ধরে ফেলেছে ওকে? অত্যাচারের মুখে যা জানে বলে দিতে বাধ্য হবে জুলি তাহলে? ধরা পড়ে যাবে আত্মগোপনকারী অনিল?

নাহ্ বড় বোকামি হয়ে গেছে। আরও অনেক সতর্ক হওয়া উচিত ছিল ওর। কিন্তু অনুশোচনা করে কোন লাভ নেই। কিসের বিরুদ্ধে সতর্ক হবে সে? অচেনা শত্রুর কাছ থেকে সতর্ক থাকা যায় না। কাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়েছে অনিল, কে মিত্র, কে শত্রু কিছুই জানে না রানা—এই অবস্থায় কিভাবে সাবধান হবে সে?

তবে এবার আক্রমণ যেদিক থেকেই আসুক না কেন, অত সহজ হবে না ওকে কাবু করা। এখন একমাত্র ভয় পুলিসকে। এই সব যন্ত্রপাতি সহ পুলিসের হাতে ধরা পড়লে বারোটা বেজে যাবে ওর।

মনডোলা লেনের ৩৭ নম্বর বাড়ি—এর বেশি আর কিছুই জানা যায়নি মেয়েটার কাছ থেকে।

ওখানেই কি লুকিয়ে আছে অনিল? গলিটাই বা কোথায়? ভেনিসের অসংখ্য গলির কোন্‌টা মনডোলা লেন? কি করে খুঁজে পাবে রানা?

একটা ঘন ছাই রঙের শার্ট ও প্যান্ট পরে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে গিলটি মিঞা। প্রস্তুত। 'কোতাউ চললেন, স্যার? আমাকে নেবেন?'

রানা না নিলেও সে যে গোপনে অনুসরণ করবে ওকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মৃদু হেসে সায় দিল রানা। সুচইটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'বাতিটা নিভিয়ে দাও দেখি?'

ঘরটা অন্ধকার হয়ে যেতেই জানালার পাশে এসে দাঁড়াল রানা, পর্দাটা ফাঁক করল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রাস্তা।

রাত এখন সোয়া একটার কম নয়। কিন্তু এখনও দলে দলে

চলেছে ট্যুরিস্টরা সান মার্কোর দিকে। গতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ, এই যা তফাৎ—লোকজন প্রচুর রাস্তায়।

মিনিট দুয়েক চেয়ে রইল রানা রাস্তার দিকে। তারপর এক টুকরো কঠোর হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর হাসি।

সান মার্কোর দিকে পিছন ফিরে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তন্দ্রালু, অলস দৃষ্টিতে ট্যুরিস্টদের দিকে চেয়ে রয়েছে একজন লম্বা লোক। পরনে তার সাদা স্যুট, সাদা হ্যাট।

ছয়

'মনডোলা গলিটা কোন্‌দিকে বলতে পারবে?'

'নিচ্চয়।' একগাল হাসল গিলটি মিঞা। 'ক্যাম্পো সান পোলোর কাচে।'

'সেটা কোথায়?'

'রিয়াল্টো ব্রিজের কাচে, স্যার। খালের ওপার। ভাঙাচোরা বাড়িঘর, নোংরা। তা ওদিকটাতেই চলেচেন বুজি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে একটা লোককে খসাতে হবে। সন্ধে থেকে পেছনে লেগে রয়েছে ব্যাটা।'

'সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন, স্যার। ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেব শালাকে।'

'না। ক্যালকেশিয়ান ঘোলে চলবে না, ও ঢাকাই ঘোল খেতে চায়। যা করার আমিই করব। তোমাকে জানানোর উদ্দেশ্য হলো ওর উপস্থিতি টের না পাওয়ার ভান করতে হবে। ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না তুমি যে কেউ আমাদেরকে অনুসরণ করছে।'

'ঠিক আচে। তাই হবে। চলুন তাহালে রওনা দিই?'

পন্টি ডেলা প্যাগলিয়ার দিকে হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে দেখল রানা, থামের গায়ে ঠেলা দিয়ে সোজা হয়ে গেল লম্বা

লোকটা। আনমনে হাঁটছে ওদের পেছন পেছন।

‘খুব সরু একটা গলিতে নিয়ে চলো দেখি প্রথমে। ব্যাটাকে খসাতে হবে আগে।’

বাঁ দিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল গিলটি মিঞা। গোলক ধাঁধার মত গলিগুলো, একটা মিশেছে আরেকটায়, সেটা গিয়ে মিশেছে আরেকটায়, যেন শেষ নেই এর। রাস্তা নির্জন। একটা মোড় ঘুরেই পছন্দসই জায়গা পেয়ে গেল রানা। একটা বাড়ির তিন ফুট উঁচু বারান্দায় উঠে পড়ল সে। গিলটি মিঞাকে বলল, ‘দুজনের পায়ের শব্দ করতে করতে এগিয়ে যাও।’

একগাল হেসে রওনা হলো গিলটি মিঞা। মিশে গেল সরু গলির প্রায়ান্ধকারে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা। ঠিক এক মিনিট পরই সাদা টুপি দেখা গেল।

সাবধানে মাথাটা সামনে বের করল অনুসরণকারী, কান পেতে শুনল পায়ের শব্দ, তারপর নিশ্চিন্ত মনে রওনা দিল গলিপথে।

দড়াম করে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি পড়ল লোকটার চোয়ালের ওপর। ভয়ানক ভাবে ঠুকে গেল মাথাটা পাশের দেয়ালে। এত জোরে শব্দ হলো যে ভয় পেল রানা খুলি ফেটে গেছে মনে করে। চট করে ধরে ফেলল লোকটার জ্ঞানহীন দেহটা, আস্তে শুইয়ে দিল মাটিতে।

নিঃশব্দ পায়ে ফিরে এল গিলটি মিঞা। মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি। ‘বড় জবর মার মেরেচেন, স্যার। এক লাতেই কাত। পকেটে কিচু আচে কিনা দেকব?’

‘দেখো।’

দ্রুত হাত চালিয়ে লোকটার সব পকেট সার্চ করল গিলটি মিঞা। কিছুই পাওয়া গেল না যা দিয়ে পরিচয় জানা যায়। বাঁ বগলের নিচে একটা খাপে পোরা থ্রোইং নাইফ। রক্তের চিহ্ন টের

পেল রানা ছুরির ব্লেডে।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। যতদূর মনে হচ্ছে, এখন ঘণ্টা খানেক নিশ্চিন্তে ঘুমোবে লোকটা।

'এবার চলো মনডেলোর দিকে। জলদি।'

মিনিট দশেক এ গলি ও গলি ধরে হাঁটার পর বড় রাস্তায় উঠল গিলটি মিঞা রানাকে নিয়ে। রানা দেখল সামনেই দেখা যাচ্ছে রিয়াল্টো ব্রিজ। মনে মনে গিলটি মিঞার গুণের প্রশংসা না করে পারল না সে। কিন্তু বড় রাস্তায় উঠে মিনিট তিনেক হাঁটার পরই কেমন যেন উসখুস শুরু করল গিলটি মিঞা। খানিক বাদে বলেই ফেলল, 'আরাকজন আচে বলে মনে হচ্চে, স্যার।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি। অত ব্যস্ত হয়ো না, এটারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

ব্রিজের মাঝামাঝি এসে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। জায়গাটায় বেশ ঘন ছায়া পড়ায় এটাই পছন্দ করল রানা।

'ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে যাও ডবল পা ফেলে।'

বেশ মজার খেলা পেয়েছে গিলটি মিঞা, একগাল হেসে এগোল সে সশব্দে দুজনের পা ফেলে ফেলে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। এক মিনিট পার হয়ে গেল। কারও দেখা নেই। দুজনেরই সন্দেহে ভুল হতে পারে? তার নিজের মনটা সন্দেহপ্রবণ হয়ে রয়েছে, সন্ধে থেকে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে বলে অতি সতর্ক হয়ে রয়েছে ইন্দ্রিয়গুলো, ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু গিলটি মিঞার ভুল হবে কেন? বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে গিলটি মিঞার। ভয়ে ভয়ে, লুকিয়ে, পালিয়ে, সাবধানে কাটিয়েছে সে চোরের জীবন বত্রিশটা বছর। ওর সজাগ চোখ ভুল করতে পারে না। কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। সামান্য ভুলে অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

দূরে গিলটি মিঞার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখনও আবছা ভাবে। ব্রিজের শেষ মাথায় চলে গেছে সে, এখনি পৌঁছে যাবে ওপারে। ঠিক মনে হচ্ছে দুজন লোক হেঁটে চলে যাচ্ছে।

আরও আধ মিনিট কাটল, তারপর হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা। বেশ কাছে। থামের গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে রইল ও। গাঢ় রঙের কাপড় পরায় দেখা যাবে না ওকে সহজে, নিজের দিকে একবার চেয়ে নিশ্চিন্ত হলো রানা। খুব সাবধানে উঁকি দিল। কয়েক সেকেন্ড কিছুই দেখতে পেল না, তারপরই চোখ পড়ল ওর কালো স্যুট পরা একজন বেঁটে লোকের ওপর। কষ্ট হলো না চিনতে।

তার মানে লোকটা আচমকা অসাবধান পথিকের সর্বস্ব অপহরণকারী নয়। সাদা আর কালো মিলেমিশে কাজ করছে। খুব সম্ভব ওর পেছনে লাগানো হয়েছে এই দুজনকে গিয়াকোমো পাসেল্লীর দোকান থেকে বেরোবার পরপরই।

লোকটার পদক্ষেপে অতি সতর্কতার লক্ষণ টের পেল রানা। খুব সম্ভব সাদা সঙ্গীর রহস্যজনক অন্তর্ধানে যার পর নাই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে সে ভিতরে ভিতরে। কিছুদূর এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, চেয়ে রইল খালের দিকে। আসলে পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে সে। পনেরো সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলতে শুরু করল। পিছু ফিরে চাইল একবার, আবার এগোল।

রানা যে-থামের আড়ালে লুকিয়ে আছে সেটা পেরিয়ে গেল লোকটা প্রায় নিঃশব্দ পায়ে। খালের ওপারে গিলটি মিঞাকে দেখতে পেল সে এবার। বিচিত্র ভঙ্গিতে ওকে পা ফেলে এগোতে দেখে আঁৎকে উঠে থেমে দাঁড়াল। ঝট করে পিছন ফিরে চাইল একবার। তারপর সাঁৎ করে সরে গেল একটা থামের আড়ালে।

ছায়ার মত নিঃশব্দে এগিয়ে এল রানা। মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে লোকটা গিলটি মিঞার দিকে। পেছন থেকে দুটো টোকা

দিল রানা লোকটার ঘাড়ে। 'কেঁউ' করে একটা ভয়ার্ত শব্দ বেরোল লোকটার গলা দিয়ে। এক লাফে সরে গেল তিনহাত তফাতে, এবং ঘুরে দাঁড়াল।

'কিছু মনে করবেন না, সিনর। ম্যাচ আছে আপনার কাছে?'

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে দুই সেকেন্ডের বেশি লাগল না লোকটার। চিতা বাঘের মত লাফ দিল রানার দিকে। ঝট করে বাঁ দিকে বাঁকা হয়ে পা চালাল রানা। এবার আর অসতর্ক নয় সে। লাথি খেয়ে চাপা একটা গোঙানি বেরোল লোকটার মুখ থেকে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল আবার। হাঁপাচ্ছে। শোলডার হোলস্টারে রাখা ছুরিটা বের করবার জন্যে চট্ করে চলে গেল ডান হাতটা কোটের ভিতর। ঠিক এই মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করল রানা। বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এল এক পা, প্রচণ্ড জোরে ঘুসি চালাল লোকটার চোয়াল লক্ষ্য করে। যন্ত্রণায় চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল লোকটার, কিন্তু অবাক হয়ে গেল রানা লোকটার সহ্যশক্তি দেখে, এই অবস্থাতেও বাঁ হাতটা চালাতে ভুল করল না। প্রচণ্ড একটা ঘুসি পড়ল রানার পাঁজরের ওপর। হেভিওয়েট বক্সার নাকি ব্যাটা? মনে হয় জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে লোকটার গ্লাভ্স পরা অবস্থায় রিং-এর ভিতর। বেকায়দা অবস্থায় ছোঁড়া ঘুসির ঠ্যালাতেই ফুস ফুস থেকে সব দম বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো রানার। চট্ করে ধরে ফেলল হাতটা। মুচড়ে ধরে পিছন ফিরে নিজের বাঁ কাঁধের ওপর ফেলল সে হাতটা চিৎ করে, তারপর মারল হ্যাঁচকা টান নিচের দিকে। তীব্র বেদনায় ককিয়ে উঠল লোকটা, পরমুহূর্তে শূন্যে উঠে গেল। রানার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল চারহাত তফাতে, প্রথমে গুঁতো খেলো থামের গায়ে, তারপর বালির বস্তার মত ধপাস করে পড়ল মাটিতে উপুড় হয়ে। কোনরকম নড়াচড়ার লক্ষণ না দেখে একটু ঘাবড়ে গেল রানা।

লোকটার পাল্‌স্‌ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সার্চ করল ওর প্রত্যেকটা পকেট। হিপ পকেট থেকে বেরোল রানার মানিব্যাগ। আর কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। হোলস্টারে থ্রোইং নাইফটা নেই দেখে রানার চোখ গেল লোকটার ডান হাতের দিকে। অজ্ঞান অবস্থাতেও ধরা আছে ছুরিটা ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে।

মানিব্যাগটা নিজের পকেটে ফেলে আর একটু অন্ধকারে টেনে দিল রানা লোকটাকে। দ্রুত এগোল। খালের ওপারে একটা গলির মুখে গিলটি মিঞাকে দেখে এগিয়ে গেল সেইদিকে।

'এবার কোন্‌ দিকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আসুন আমার পিছু পিছু।'

গলিটা ধরে বেশ কিছুদূর গিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত সরু গলিতে ঢুকল গিলটি মিঞা। বলল, 'এইটেই।'

এ গলির দুই ধারে শত শত বছরের পুরানো ঝুর ঝুরে ভাঙা সব বাড়ি। মনে হয় এখুনি হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর পড়বে বুঝি। একটি বাতি নেই কোন বাড়ির জানালায়। পকেট থেকে টর্চটা বের করল রানা।

'এসব বাসায় কোন লোক আচে বলে মনে হয় না, স্যার।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা নিচু গলায়। 'খুব সম্ভব সব ভেঙে আবার নতুন করে বাড়ি তোলা হবে বলে লোকজন সরিয়ে দেয়া হয়েছে।' একটা দেয়ালের গায়ে লেখা নম্বর দেখে এগোল রানা সামনে। 'সাঁইত্রিশ নম্বরটা আরও আগে বলে মনে হচ্ছে।'

তিনটে বাড়ি ছেড়েই পাওয়া গেল বাড়িটা। দোতলা বাড়ি। প্লাস্টার খসে যাওয়ায় দাঁত বের করে হাসছে লাল লাল ইঁট। ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা নিঃশব্দে। এত নিঃশব্দে খুলল যে থমকে গেল রানা একটু। চট করে টর্চের আলোটা চলে গেল দরজার হিঞ্জে।

'তেল দোয়া হয়েচে স্যার,' বলল গিলটি মিঞা ফিসফিস

করে। 'মনে হচ্চে লোক আচে।'

ভিতরে আলো ফেলল রানা। একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে কিছু দূর গিয়ে বাঁ পাশে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি।

'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, আমি ঢুকছি ভিতরে,' বলল রানা। 'চোখ কান খোলা রাখবে।'

'নিচ্চয়।'

দু'পা এগিয়েই বসে পড়ল রানা। কাঠের মেঝে, ধুলো জমে আছে পুরু হয়ে, তার ওপর অনেকগুলো পায়ের ছাপ। মেয়েমানুষের জুতোর ছাপ দেখতে পেল রানা একজোড়া। উঠে দাঁড়াল।

সাবধান করল গিলটি মিঞা। 'একটু সাবধানে পা ফেলবেন, স্যার। পচা কাটে পা পড়লে একেবারে ঝপাৎ করে পড়বেন পানিতে। নিচে পানি।'

পেছন ফিরে ভ্রূকুটি করল রানা, কিন্তু সেটা দেখতে পেল না গিলটি মিঞা। তাই চাপা গলায় বলল, 'চুপ করে থাকো, কথা বোলো না।'

সিঁড়ির পাশেই একতলায় ঢোকার দরজা। আস্তে করে হ্যান্ডেলে চাপ দিয়ে ঠেলা দিল রানা দরজাটা। ক্যাঁ...চ করে বিচ্ছিরি একটা শব্দ করে ফাঁক হয়ে গেল দরজা। চট্ করে ঘরের চারপাশে আলো বুলাল রানা। কেউ নেই ঘরে। অসংখ্য ঝুল, আর ধুলো। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ এল নাকে। প্রকাণ্ড একটা মাকড়সা সড়সড় করে সরে গিয়ে একটা ঘুণে খাওয়া পচা তক্তার নিচে আত্মগোপন করল। দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে সিঁড়ির ধাপ পরীক্ষা করল রানা। ধুলো জমে আছে সিঁড়িতেও। পায়ের ছাপ দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল দু'এক দিনের মধ্যেই একাধিক লোক ওঠানামা করেছে এ সিঁড়ি দিয়ে। এক আধটা হাই হিলের ছাপও দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে।

সাবধানে কাঠের সিঁড়িতে কোন রকম আওয়াজ না করে উঠে এল রানা দোতলায়। দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে।

কান পাতল রানা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল আধমিনিট। নাক ডাকা তো দূরের কথা কারও নিঃশ্বাস পতনেরও শব্দ নেই। নিঝুমপুরী। প্রথম দরজার হ্যান্ডেলে চাপ দিল সে। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা।

দরজাটা দুই ইঞ্চি ফাঁক হতেই হঠাৎ একটা শব্দ হলো ঘরের ভিতর। আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। খচমচ করে কাগজ নাড়ার শব্দ হলো, তারপর মৃদু একটা ধুপ।

টর্চটা নিভিয়েই চট্ করে সরে গেল রানা দরজার সামনে থেকে। ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে স্টিলেটো। দ্বিগুণ হয়ে গেছে বুকের ভিতর ঢিবঢিব শব্দ। আবার খচমচ আওয়াজ। আবার একটা মৃদু ধুপ শব্দ। পরমুহূর্তে কিচমিচ করে ডেকে উঠল ছুঁচো।

হাঁপ ছাড়ল রানা। ছুঁচোর কেত্তন।

পা দিয়ে কপাটের গায়ে একটা ঠেলা দিয়েই আলো ফেলল সে ঘরের ভিতর।

প্রকাণ্ড একটা ছুঁচো। থতমত খেয়ে গেল প্রথমটায়, তারপর ভয় পেয়ে ছুটে গেল দেয়ালের দিকে, লাফ দিয়ে ধাক্কা খেলো দেয়ালের গায়ে, ধুপ করে পড়ল মেঝেতে, তারপর বিদুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের অন্ধকার কোণে।

ঘরের মাঝখানে ঢিবির মত উঁচু হয়ে আছে কি যেন। রানার টর্চের উজ্জ্বল আলোটা এসে স্থির হলো সেখানে।

পুরু ধুলোর ওপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জুলি মাযিনি। উলঙ্গ। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে ছাতের দিকে। বাঁ স্তনের নিচে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন।

মস্ত বড় একটা কদাকার মাকড়সা খুব সম্ভব রক্ত চাটছিল, রানাকে

এগোতে দেখে ভয় পেল। সড়সড় করে জুলির বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করল ঘাড়ের পাশে চুলের অন্ধকারে, জায়গাটা পছন্দ হলো না, চিবুক বেয়ে উঠে ওর নাক, মুখ আর খোলা চোখের ভিতর লোমশ পা ফেলে কপালে উঠল, সেখান থেকে একলাফে মেঝেতে পড়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল দুই তক্তার ফাঁকে একটা গর্তে। যেমন ছিল তেমনি শুয়ে আছে জুলি। স্থির।

চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে রানার কপালে। সারাটা ঘর ঘুরে এসে আবার স্থির হলো টর্চের আলোটা জুলির ওপর। ছুঁচোটা দৌড়ে পালাল খোলা দরজা দিয়ে। হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল রানা মেঝেতে।

শুধু ধর্ষণ নয়, সারা শরীরে জায়গায় জায়গায় সিগারেটের আগুন ঠেসে ধরার চিহ্ন দেখতে পেল রানা। যা জানার জেনে নিয়ে ছুরি মারা হয়েছে ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর।

প্রচণ্ড ক্রোধ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল রানার মাথার ভিতর। বহু কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে আত্মসংবরণ করল রানা। আঙুলের উল্টো দিক দিয়ে মেয়েটার গাল ছুঁয়ে দেখল, এখনও গরম। বড়জোর আধঘণ্টা আগে মারা গেছে।

ওকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে নিশ্চয়ই পিছু ধাওয়া করে ধরেছিল জুলিকে ওরা দুজন। তারপর নির্যাতন করে জেনে নিয়েছে অনিলের ঠিকানা। এখানে নিয়ে এসে মেরে রেখে গেছে। অনিলকে এখানে পেয়েছিল ওরা? নিশ্চয়ই পাশের ঘরটায় ছিল অনিল? আছে?

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। দরজাটা বন্ধ করে সাবধানে চাপ দিল পাশের দরজার হ্যান্ডেল। দরজাটা এক ইঞ্চি ফাঁক করে সেখানে কান পাতল। কোন শব্দ নেই। তাহলে কি অনিলকেও...

আর এক ইঞ্চি ফাঁক করেই দরজার ফাঁকে টর্চ ধরল রানা। চট্ করে ঘুরিয়ে আনল আলোটা সারা ঘরে। এক নজরে বুঝতে

পারল এটাই অনিলের ঘর।

একটা ক্যাম্প খাটের ওপর দুটো কম্বল বিছানো, পাশেই একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর কিছু ফলমূল, ক্যান্ড ফুডের টিন, অর্ধেক মোমবাতি।

কেউ নেই ঘরে।

ঘরের ভিতর চলে এল রানা। মোমবাতিটা জ্বালল। চাইল চারদিকে।

ঘরের কোণে একটা এয়ার ব্যাগ। তার ভিতরের সমস্ত জিনিস ধুলো ভর্তি মেঝের ওপর ছড়ানো। খাটের নিচে একটা ব্রীফকেস। খোলা। ব্রীফকেসের গায়ে অনিলের নামের আদ্যাক্ষর লেখা। এ.সি.–অর্থাৎ অনিল চ্যাটার্জী। মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসগুলোর উপর চোখ বুলাল রানা। একটা বিস্কিটের টিন, রুমাল, গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার, জিলেট শেভিং কিট, পাসপোর্ট, টেক টুথব্রাশ, ফরহ্যান্স টুথপেস্ট, পামোলিভ সাবান। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভালমত সার্চ করা হয়েছে অনিলের প্রতিটা জিনিস। তবু একবার ভাল করে খুঁজে দেখল রানা–কিছুই পাওয়া গেল না।

আর একবার চোখ বুলাল সারা ঘরে। কেন লুকিয়ে ছিল অনিল এই ঘরে? কারা খুঁজছে ওকে? ভারতীয় গুপ্তচরেরা, নাকি ইটালিয়ানরা, নাকি অন্য কেউ? কেন প্রাণ দিতে হলো জুলি মাযিনিকে? কি এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ফেঁসে গেল অনিল? কোথায় এখন ও? ধরা পড়ল? কাদের হাতে?

হঠাৎ দেখতে পেল রানা রক্তমাখা ব্যান্ডেজ। দরজার কোণে দলা করে রাখা। আহত হয়েছে অনিল? তাই পালিয়ে যেতে পারছে না, এখানে ওখানে লুকিয়ে ফিরছে, সাহায্য চাইছে?

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা। এমন কিছু ফেলে যাওয়া চলবে না যাতে জুলির হত্যাকারী বলে ফেঁসে যেতে পারে অনিল। পুলিস যদি প্রমাণ করতে পারে যে এই ঘরের জিনিসগুলো অনিলের

তাহলে চার্জশীট দাখিল করবে অনিলেরই বিরুদ্ধে।

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উদয় হতেই চমকে উঠল রানা। অনিলই খুন করেনি তো জুলিকে? কি প্রমাণ আছে রানার কাছে যে ওই সাদা আর কালো স্যুট পরা লোক দুজনই খুন করেছে ওকে? এমনও তো হতে পারে, সাবধান করতে এসেছিল জুলি এখানে, সেই সময় অনিল...

মাথা নেড়ে আজে বাজে চিন্তা দূর করে দিল রানা। এসব আবোল তাবোল ভাবনার শেষ নেই। খামোকা ভেবে লাভ হবে না। দ্রুত হাতে কিছু কিছু জিনিস তুলে ব্রীফকেসের ভিতর সাজিয়ে রাখতে শুরু করল রানা।

'পুলিস আসচে, স্যার!' ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

চমকে দরজার দিকে ফিরল রানা। নিঃশব্দ পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গিলটি মিঞা।

'কোথায়? কতদূরে?' প্রশ্নটা করেই হুইসেলের শব্দ শুনতে পেল রানা। বেশ কাছেই।

'পুলের এ মাতায় এসে গেচে। আমার সন্দো হচ্চে এইদিকেই আসচে ওরা।'

নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার টের পেল রানা। পাশের ঘরে ধর্ষিতা মৃতদেহ। এত রাতে এখানে কি করছে সে, তার কোন সন্তোষজনক জবাব নেই। পকেটে বার্গলার্স কিট। ধরা পড়লে সবকিছু চাপবে এখন ওরই কাঁধে। এই কেলেঙ্কারির দায় থেকে ছুটে বেরোনো সহজ হবে না।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'তুমি তোমার জায়গায় যাও, গিলটি মিঞা। ওরা এই বাড়িতে না-ও আসতে পারে।' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার বাজল হুইসেল। রানা বুঝতে পারল, এই গলিতেই ঢুকছে পুলিস। রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল গিলটি মিঞা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে। রানা বলল, 'বাইরে থেকে দরজার বল্টু

লাগিয়ে দিয়ে লুকিয়ে পড়ো কাছাকাছি কোন বাড়িতে। যদি দেখো এ বাড়িতেই ঢুকছে পুলিস, তাহলে তোমার প্যাঁচার ডাকটা একবার ডেকে বাসায় ফিরে যাবে। যাও।'

একটু ইতস্তত করল গিলটি মিঞা রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে, কিন্তু তর্ক করল না। দ্রুতপায়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। আধমিনিটের মধ্যেই ব্রীফকেস হাতে নামতে শুরু করল রানা সিঁড়ি বেয়ে।

ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেই শুনতে পেল প্যাঁচার ডাক। বাকি কয়েক ধাপ প্রায় উড়ে নেমে এল সে। দড়াম করে খুলে গেল বাইরের দরজাটা। পাঁচ ছ'টা টর্চের উজ্জ্বল আলোয় দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল সরু প্যাসেজটা।

সাঁৎ করে সরে গেল রানা। ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে। একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। 'দুজন থাকো গেটের সামনে। তোমরা এসো আমার সঙ্গে।'

সিঁড়ির পাশের দরজার হ্যাণ্ডেলে চাপ দিল রানা। ক্যাঁচ শব্দ করে খুলল একটা কবাট। ঢুকে পড়ল ভিতরে। দরজাটা বন্ধ করবার সাহস হলো না আর। দেয়ালের গায়ে সেঁটে সরে গেল দু'পা।

ঢিব ঢিব করছে বুকের ভিতর। টর্চের আলো এসে পড়ল ঘরে। একজন টর্চ হাতে ঢুকে আসছে।

'ওদিকে না,' বলল একজন। 'ওপরে।'

তবু খালি ঘরে একবার টর্চ বুলাল লোকটা। দেয়ালের গায়ে সেঁটে দম বন্ধ করে রেখেছে রানা। সরে গেল লোকটা দরজার সামনে থেকে। ধুপ ধাপ আওয়াজ আসছে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার।

আস্তে করে সরে এল রানা জানালার কাছে। পায়ের নিচে পচা কাঠ ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো। চট্ করে জানালার হ্যাণ্ডেলটা

ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল রানা শরীরের ওজন কমাবার জন্যে। মাথার ওপর কয়েক জোড়া বুটের শব্দ। আস্তে ছিটকিনি খুলে জানালা টপ্‌কে ওপারে চলে গেল রানা। ভিড়িয়ে দিল জানালা। কয়েক ফুট নিচে টলটল করছে পানি। মৃদু একটা ঝুপ শব্দ করে নেমে গেল সে পানিতে।

আন্দাজে ভর করে ব্যাক-স্ট্রোক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে রানা। দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে ব্রীফকেসটা।

চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। আধঘণ্টা পর পৌঁছল ক্লান্ত রানা রিয়াল্টো ব্রিজের কাছাকাছি। মিনিট তিনেক বিশ্রাম নিয়ে উঠে পড়ল পারে। চিন্তা হলো, ফিরবে কি করে?

'ভিজে তো একেবারে জবজবে হয়ে গেচেন, স্যার!' গিলটি মিঞার মোলায়েম কণ্ঠস্বর।

'তুমি যাওনি এখনও?'

'না স্যার, ভাবলাম খেলাটা একটু দেকেই যাই। নুকিয়ে ছিলাম, লাশটা নিয়ে ওরা বিদেয় হতেই আবার গিয়ে ঢুঁকলাম ওই বাড়িটায়। আপনাকে কোতাউ খুঁজে না পেয়ে খাল ধরে ধরে এ পর্যন্ত এয়েচি। দেকি কুমীর দেকা যায়। তাই ডেঁড়িয়ে রইচি। মনে করলুম, নতুন মানুষ, এই শহরের গলিঘুঁচি চিনে বাসায় ফেরা কষ্ট হবে আপনার পক্ষে। এই ভেজা কাপড়ে কাউকে কিছু জিগেস করতে গেলেউ সন্দো করবে। তাছাড়া রাস্তায় লোক কোতায় যে জিজ্ঞেস...'

রানার কান খালি পেয়ে পেটের মধ্যে যত কথা আছে সব ঝেড়ে নামাবার উপক্রম করল গিলটি মিঞা। বকবকানিতে কান না দিয়ে দ্রুত কাপড় ছাড়ছে রানা। অনিলের শার্ট এবং প্যান্ট পরে নিল ও। লন্ড্রির চিহ্ন রয়েছে বলে নিয়ে এসেছে সে এগুলো ব্রীফকেসের মধ্যে করে। আঙুল বুলিয়ে চুলগুলো মোটামুটি ঠিক করে নিয়ে পাড় বেয়ে উঠে এল সে রাস্তায়।

দ্রুত পায়ে ফিরে যাচ্ছে ওরা বাসার দিকে। পথে আগাগোড়া সবটা ব্যাপার বলল রানা গিলটি মিঞাকে। সব শুনে গুম হয়ে গেল গিলটি মিঞা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করবার পর বলল, 'মস্ত গ্যাঁড়াকলে জড়িয়ে পড়েচেন, স্যার। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না–না ইন্ডিয়া, না বাংলাদেশ। এদিকে কেসটার কোন সুরাহা হবার তো কোন হদিস দেকচি না। অনিল বাবুকে পেলে নাহায়...'

'পেতেই হবে আমাদের।'

'কোতায় খুঁজবেন? সূত্র যা ছিল সব তো ছিঁড়ে গেল। কোতায় পাবেন ওনাকে অন্দোকার হাতড়ে?'

'ঠিকই বলেছ। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে ওই মেয়েটার আত্মীয়-স্বজনের কাউকে খুঁজে বের করা। তাদের কাছে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। হয়তো কোন পথ পাওয়া যেতে পারে এগোবার।'

সান মার্কোর পেটা ঘড়িতে ঠিক যখন তিনটে ঘণ্টা পড়ল তখন পৌঁছল ওরা বাসায়।

বিশ্রাম দরকার। গিলটি মিঞাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল রানা। প্রথমেই জামা-কাপড় ছেড়ে শাওয়ারের নিচে ভিজল সে মিনিট পাঁচেক, তারপর গা-হাত-পা মুছে পরে নিল ঘুমোবার পোশাক। খাটের কিনারে বসে একটা সিগারেট ধরাল। ভ্রূ কুঁচকে মেঝের দিকে চেয়ে রয়েছে সে।

বাঁ হাতে চোয়ালটা ডলতে ডলতে সন্ধে থেকে এ পর্যন্ত সবগুলো ঘটনা আগাগোড়া পর্যালোচনা করল সে মনে মনে। অনেক ঘটনাই ঘটল, কিন্তু কতটা এগোতে পেরেছে ও? এটুকু নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে যে ভেনিসেই ছিল অনিল এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত। ব্যস। ওকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে ও এখনও। এগোতে পারেনি এক পা-

ও।

বেঁচে আছে অনিল? নাকি মেয়েটার মত তাকেও শেষ করে ফেলা হয়েছে? কারা কাজ করছে ওর বিরুদ্ধে?

পুলিস খবর পেল কিভাবে? মহা ঝামেলা হয়ে যেত যদি ও ধরা পড়ত ওই বাড়িতে পুলিসের হাতে। ওকে ঝামেলায় ফেলার জন্যেই কি খবর দেয়া হয়েছিল পুলিসে? তৃতীয় কোন অনুসরণকারী ছিল, ওকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দেখেই যে ফোন করেছে পুলিসে? নাকি পুলিসই জড়িত আছে এ ব্যাপারে?

চলতে চলতে হঠাৎ যেন একটা প্রকাণ্ড উঁচু প্রাচীরের সামনে হাজির হয়েছে রানা। এগোবার তো নয়ই, ভাবনারও কোন পথ পাচ্ছে না। খামোকা দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে লাভ নেই। তার চেয়ে একটা ঘুম দিয়ে চাঙ্গা করে নেয়া দরকার শরীরটা।

শুয়ে পড়ল রানা। চোখ বুজতেই ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে জুলি মাযিনির লাশটা।

কেন প্রাণ দিতে হলো মেয়েটাকে?

সাত

জুলি মাযিনির ঠিকানা বের করবার একটা বুদ্ধি খেলেছে রানার মাথায়। কিন্তু নিজে গেলে চলবে না, চিনে ফেলবে, তাই শিখিয়ে পড়িয়ে বাইরে পাঠাল সে গিলটি মিঞাকে। আটটায় বেরিয়ে গেল গিলটি মিঞা, সাড়ে আটটার দিকে বেরিয়ে পড়ল রানাও। দেড়টা-দুটোর আগে ফিরবে না গিলটি মিঞা, ততক্ষণ চুপচাপ বসে না থেকে ভাবল একটু ঘুরে ফিরে এলে মন্দ হয় না।

গনডোলা স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছেই একটা মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়াল রানা।

'সিনর মাসুদ রানা না?'

লুইসা পিয়েত্রো। ঝিকমিক করছে সকালের রোদে, যেন চকচকে সিকি। মুখে উজ্জ্বল হাসি, চোখে বিদ্যুৎ। মনে মনে নিজের কপালকে ধন্যবাদ দিল রানা। কিন্তু এখন ভজাতে পারলে হয়। মধুর হাসি হাসল রানা।

'আরে! আপনি! কি খবর?

'ভাল্লাগছিল না, চলে এলাম খানিকক্ষণ গনডোলায় চড়ে যেদিক খুশি ঘুরব মনে করে। আপনার চোয়ালের অবস্থা কি রকম?'

'সেরে গেছে প্রায়। বেদম ঘুমিয়েছি কাল সারারাত। তা আপনার ভাই কোথায়?'

'ও ব্যস্ত আছে ওর ব্যবসা নিয়ে। আমার করবার কিছুই নেই বলে বেরিয়ে পড়েছি। একবার ভাবছিলাম আপনার বাসায় গিয়ে দেখি আপনি ব্যস্ত আছেন কিনা, তারপর আবার ভাবলাম কি আবার মনে করবেন আপনি...'

'কি মনে করব আবার? এ তো আনন্দের কথা। চলুন না?'

'দেখা তো হয়েই গেল। কোথায় চলেছিলেন? কাজে?'

'নাহ্, আমারও আপনার মত একই সমস্যা। সময় কাটছিল না বলে চলেছিলাম কলিওনির স্ট্যাচু দেখতে। যাবেন নাকি? গনডোলা চড়াও হবে, একটা মহৎ সৃষ্টিও দেখে আসা যাবে।'

রাজি হয়ে গেল মেয়েটা। এত সহজে রাজি হয়ে যাওয়ায় রানা চট করে ভেবে নিল একবার, ভুল হয়ে গেল কিনা। বাসায় নিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত, বলা যায় না, হয়তো রাজিও হয়ে যেতে পারত। যাই হোক, বড়শিতে যখন গাঁথা গেছে, খানিক খেলালেই উঠে আসবে ডাঙায়। অতি আগ্রহ দেখালে একেবারে ফসকে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। নিজেকে প্রবোধ দিল সে, ধীরে, বন্ধু ধীরে।

মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল প্রকাণ্ড চেহারার একজন

গনডোলিয়ার। উনিশ বিশ বছরের ছোকরা, কিন্তু তার পেশী দেখলে হিংসের উদ্রেক হবে যে কোন পাকাপোক্ত বডি-বিল্ডারের। হাত ধরে গনডোলায় উঠতে সাহায্য করল রানা লুইসাকে। একটু যেন বেশি মাত্রায় ভয় পেল মেয়েটা গনডোলাটা দুলে ওঠায়, প্রায় জড়িয়ে ধরল রানাকে, বসে পড়ল একেবারে ওর গা ঘেঁষে।

'ইল ক্যাম্পো ডেই সান্তি গিয়োভানিই পাওলো,' বলল রানা গনডোলিয়ারকে।

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল মাঝি। ছেড়ে দিল গনডোলা।

'আপনার ভাই কিসের ব্যবসা করেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কাঁচের। সারা ইউরোপে বত্রিশটা ফ্যাক্টরি আছে আমাদের। ফ্রান্সেরটা বাবাই দেখেন, অন্যান্যগুলো দেখে সিলভিও।' হাসল লুইসা। 'বছরে দুবার করে আসতে হয় ওকে ভেনিসে। আমার অবশ্য এই প্রথম।'

'কাঁচের ব্যবসা করে আপনার ভাই?'

'অবাক হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে? পিয়েত্রো গ্লাস ফ্যাক্টরির নাম শোনেননি?'

শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো রানার মধ্যে। মেয়েটার ঊরুর উষ্ণ স্পর্শে, না কাজল চোখের মদির চাহনিতে, নাকি কথায়? মনের কোণে কোথায় যেন টুং-টাং করে একটা সাবধানী ঘণ্টা বেজে উঠল।

'সত্যি শুনিনি। একজন বিদেশীর পক্ষে...'

'তা ঠিক। ক্যালকাটায় আমাদের একটা শাখা আছে। বাংলাদেশে নেই। কাজেই আমাদের নাম না জানারই কথা আপনার।'

আরও সতর্ক হয়ে গেল রানা। যেন কথার কথা আলাপ করছে এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কলকাতাতেও যেতে হয় নাকি আপনার ভাইকে?'

'না। গোড়ার দিকে দুবার-একবার যেতে হয়েছিল, এখন ওখানকার কর্মচারীরাই দেখাশোনা করে।'

'এখানে ভেনিশিয়ান কাঁচ কিনতে এসেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। গিয়াকোমো পাসেল্লী এখানে আমাদের একটা এজেন্ট। এর নামও নিশ্চয়ই শোনেননি আপনি?'

ভিতর ভিতর ডিগবাজি খেয়ে উঠেছে রানা। মাথা নাড়ল নিরুৎসুক ভঙ্গিতে। 'মনে পড়ছে না। দুঃখিত।'

টুকিটাকি কথা হলো কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ল রানা। 'আচ্ছা, জুলি মাযিনি নামে একটা মেয়ে বোধহয় কাজ করে পাসেল্লীর দোকানে?'

'ঠিক বলেছেন। ওকে চিনলেন কি করে?' অবাক দুচোখ মেলে ধরল লুইসা রানার চোখের দিকে।

'আমার এক বন্ধুর মুখে নাম শুনেছি। প্রেম আছে দুজনের।'

'কার কথা বলছেন আপনি? অনিল চ্যাটার্জী?'

'চেনেন নাকি ওকে?' বিস্ফারিত রানার চোখ।

'চিনি মানে? আমার ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুবই অমায়িক ভদ্রলোক।'

নিজের অজান্তেই সামনে ঝুঁকে এল রানা কিছুটা।

'কবে শেষ দেখা হয়েছে আপনাদের ওর সাথে?'

'দিন তিনেক আগে। কেন?'

হঠাৎ আড়চোখে গনডোলিয়ারের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। কি শুনছে লোকটা? বৈঠাটা শূন্যে ধরা, বাইতে ভুলে গেছে, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁ করে শুনছে ওদের কথা। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ওর দিকে রানা। বলল, 'কিছু বলবে তুমি?'

সংবিৎ ফিরে পেয়ে সোজা হয়ে গেল ছেলেটা, মাথা নেড়ে নিষেধ করে আবার মন দিল কাজে।

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাতিস্তা।' গম্ভীর মুখে নামটা উচ্চারণ করেই অন্য দিকে মুখ ঘোরাল সে। বোঝা গেল আর কোন আলাপে সে আগ্রহী নয়। এটাও বোঝা গেল, একটি শব্দও এড়াবে না ওর কান। সরল ঔৎসুক্য!

নিশ্চিন্ত হয়ে আবার মন দিল সে লুইসার প্রতি।

'যাক, ভেনিসেই আছে তাহলে।' হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। 'বেশ অনেকদিন দেখা নেই ওর সঙ্গে। আমি যে ভেনিসে এসেছি জানে না ও। চমকে দেয়া যাবে ওকে। আছে কোথায় ও?'

'তিনদিন আগে এখানে ছিল,' একটু যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে লুইসার চোখ-মুখ। 'ওকে দেখে বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম এবার আমি আর সিলভিও। মনে হলো কোন বিপদের মধ্যে আছে ও।'

'বিপদ? তার মানে?'

'এমন তাড়াহুড়ো করে চলে গেল, কেমন একটু অপ্রকৃতিস্থ মনে হলো আমার কাছে। সিলভিওকে বললাম, ও বলল, ও-ও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। অস্বাভাবিক চঞ্চল দেখাচ্ছিল ওকে।'

'তাড়াহুড়ো করে কোথায় চলে গেল?'

'প্যারিস। তিনদিন আগে প্যারিসে চলে গেছে অনিল।'

নিরতিশয় হতাশ হলো রানা। 'ধুশ শালা, দেখা হলো না তবে এবার।' গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে গনডোলা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রানা। 'এই যে এসে গেছি।' হাত ধরে নামাল লুইসাকে। ছেলেটাকে বলল, 'তুমি অপেক্ষা করবে, না ভাড়া নিয়ে বিদায় হতে চাও?'

'অপেক্ষা করব।' গম্ভীর মুখে নৌকোটা বাঁধছে ছেলেটা।

ইকোয়েস্ট্রিয়ান-স্ট্যাচুর ওপর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল রানা। মনের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে চলেছে অন্য চিন্তা। মুখে সে

অনর্গল বলে চলেছে কলিওনি কে ছিল, কেমন ভাবে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির গুরু ভেরোশিও তৈরি করেছিল এই মূর্তি। জানাল, পৃথিবীতে এই অপূর্ব মূর্তির সমকক্ষ আর একটি মাত্র মূর্তি আছে, সেটা হচ্ছে ডোনাটেলোর গাটামেলাটা।

মনের মধ্যে চিন্তা চলেছে, অনিলের প্রসঙ্গ উঠে পড়া একটা দৈব-সংযোগ, না ইচ্ছাকৃত ব্যাপার? গনডোলা স্টেশনে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে লুইসার সঙ্গে, না এ দেখাটা পূর্ব-পরিকল্পিত? গত রাতে পথ হারিয়ে রানাকে অজ্ঞান অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিল দু'ভাই বোন, নাকি সেটাও সাজানো? এরা কি অনিলের শত্রুপক্ষ, না বন্ধু? লুইসাকে কি পাঠানো হয়েছে রানাকে চোখে চোখে রাখার, কিংবা ভুলিয়ে অন্য কিছুতে ব্যস্ত রাখার জন্যে?

নাহ্ বড় বেশি ভাবছে সে। এসব ভাবনার কোন কূল কিনারা নেই। সতর্ক থাকলে আপনিই বেরিয়ে আসবে সব কিছু। সর্বদা সতর্ক, প্রস্তুত থাকতে হবে ওকে। বড় বেশি জটিল হয়ে উঠেছে সবটা ব্যাপার ক্রমে। স্রোতে ভেসে যেতে হবে এখন বেশ কিছুদূর, নইলে বোঝা যাবে না নদীর জল ঠিক কোন্দিকে বইছে, কোথায় ঘূর্ণিপাক।

গির্জাটাও দেখল ওরা ঘুরে ফিরে। কখন যে রানার হাতে ধরা পড়েছে ওর হাতটা খেয়াল করেনি লুইসা, কিংবা খেয়াল না করার ভান করেছে; কখন যে হাঁটতে হাঁটতে নির্জন জায়গায় চলে এসেছে লক্ষ করেনি, লক্ষ করতে হলো যখন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল রানা ওর চোখে চোখ রেখে। সংবাদটা ঠিকই পৌঁছল ওর মনের গভীরে, রানার চোখে যে মদির আকর্ষণ দেখতে পেয়েছে তার অর্থ ব্যাখ্যা করে নিতে ভুল করল না। রানার বাঁ হাতটা জড়িয়ে ধরেছে ওর ক্ষীণ কটি। চোখে কপট শাসানি ফুটিয়ে তুলে ঠোঁটে লাজুক হাসি হাসল লুইসা। অমোঘ আকর্ষণে সেঁটে গেল রানার গায়ে। চিবুকটা একটু উঁচু করে প্রস্তুত হলো দুটি তৃষিত অধর।

চোখ দুটো ভেজা ভেজা।

গোরস্থানের পিছনে বেশ কিছু জায়গা ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে বেঞ্চ পাতা। নির্জন। যেন কি এক ঘোরে পড়ে চলে এল ওরা জঙ্গলের ধারে। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল লুইসা, থমকে দাঁড়াল।

'এখানে না, প্লীজ।'

'কোথায়?'

'তোমার বাসায়।'

লুইসার চোখে চোখ রেখে হাসল রানা। আনত হলো লুইসার দৃষ্টি, রানার কোটের একটা বোতাম খুঁটছে। চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করল রানা।

'কবে? কখন?'

জবাব দিল না লুইসা। বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরল রানার কনুই, টানল গনডোলার দিকে।

চলতে শুরু করল দুজন। ঘাড় বাঁকিয়ে রানার মুখের দিকে চাইল লুইসা।

'রাগ করোনি তো, রানা?'

উত্তর না দিয়ে হাসল রানা।

'রাগ করারই কথা অবশ্য। ইটালিয়ান আইন কি বলে জানো?'

'কি বলে?'

'এই যে একটু আগে বারণ করলাম, এই অপরাধে আমার এক বছরের জেল হয়ে যেতে পারত, যদি আমি তোমার স্ত্রী হতাম।'

'যাহ্!'

'সত্যি। জেল হোত তুমি নালিশ করলে।'

'স্বামী না হয়েও যদি নালিশ করে বসি?'

হা-হা করে হাসল লুইসা। ‘তাহলে তোমার জেল হবে। ভালই হবে।’

গনডোলায় উঠে পড়ল দুজন। লুইসার লিপস্টিক মুছে যাওয়া ঠোঁটের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিল ছোকরা গনডোলিয়ার। এর ফলে সচকিত হয়ে উঠল লুইসা। চট্ করে হ্যান্ডব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা আয়না বের করে দেখল নিজেকে। কপট রাগের ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল রানার প্রতি।

‘কী অবস্থা করেছে! দস্যু কোথাকার!’

একটা ছোট্ট রুমাল বের করে ঠোঁট মুছে নিয়ে নিজেকে আবার মেরামতের কাজে লাগল লুইসা।

তিনদিন আগে প্যারিস চলে গেছে অনিল—কথাটা চমকে দিয়েছে আসলে রানাকে। যদি সত্যি হয়, তাহলে ও মিছেমিছেই খুঁজে মরছে ওকে এখানে। কিন্তু কথাটা কি সত্যি? ভুল খবর জেনেছে লুইসা, নাকি মিথ্যে কথা বলছে?

ভেবেচিন্তে দেখে অনিলের প্রসঙ্গটা আবার তোলার সিদ্ধান্ত নিল রানা। সিগারেট ধরাল একটা।

‘বড় খারাপ লাগছে একটুর জন্যে অনিলকে মিস করে। ও থাকলে ভেনিসের ছুটিটা খুব জমত।’

‘হ্যাঁ। খুবই ভাল লোক। আমাদের সাথে খুবই সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে। অনেকটা পারিবারিক বন্ধুও বলতে পারো। নিয়মিত আসা যাওয়া, খোঁজ খবর করা, ক্রিস্‌মাসে উপহার দেয়া, সব দিক থেকে যথার্থ বন্ধু যাকে বলে। তাছাড়া সৎ লোক। ভুলেও কোনদিন আমার প্রতি আবছা ইঙ্গিতেও কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ করেনি।’ গলাটা খাটো করে বলল, ‘তোমার মত নয়।’

হাসল রানা। বলল, ‘ওর তো জুলি মাযিনি আছে। আমার কে আছে? অভাবে স্বভাব নষ্ট।’ আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল চট করে। ‘প্যারিসে চলে গেছে, ঠিক জানো তুমি?’

'জানি। আমরা দুজন ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিলাম। এমন তাড়াহুড়ো করতে দেখিনি আর ওকে কোনদিন। মনে হচ্ছিল যেন কেউ তাড়া করছে ওকে, ও পালাচ্ছে। ভীত সন্ত্রস্ত একটা ভাব।'

'কি হয়েছে জিজ্ঞেস করোনি ওকে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লুইসা।

'করেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই বলল না। সিলভিও-ও বারকয়েক জিজ্ঞেস করল, যে-কোন বিপদ ঘটে থাকুক না কেন সাধ্যমত সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিল, কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলল না ও। বলল, এটা এমন একটা ব্যাপার যা আমাদের না জানাই ভাল। জানলে নাকি আমরাও বিপদে পড়তে পারি। প্যারিসে পৌঁছতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ওর অবস্থা দেখে আমরাও আর বেশি চাপাচাপি করলাম না। আমরা একটা পার্টিতে যাচ্ছিলাম, এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই ছাড়ল না আমাদের, জেদ ধরল ওকে স্টেশনে পৌঁছে দিতেই হবে। খুব সম্ভব পথে কোন রকম আক্রমণের ভয় পাচ্ছিল ও। আমরাও বেশি তর্ক না করে পৌঁছে দিলাম ওকে স্টেশনে। সেই থেকে মনটা খারাপ হয়ে আছে সিলভিওর।'

'অদ্ভুত ব্যাপার,' বলল রানা। 'কতদিন ধরে ভেনিসে আছে ও? রোমে ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে কাজ করত না অনিল?'

'হ্যাঁ। তবে কাজটা ঘোরাঘুরির। যেসব মাল ভারত আমদানী করে সেসব সরেজমিনে পরীক্ষা করার কাজ ছিল ওর। সেই সূত্রেই তো সিলভিওর সাথে বন্ধুত্ব। পিয়েত্রোর প্রচুর মাল যায় ভারতে। দিন পাঁচেক আগে আমরা ভেনিসে এসে দেখলাম ও এখানে।'

'প্যারিসে কোথায় উঠেছে ও বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ। টেলিফোনে আলাপ করতে পারো ওর সঙ্গে। হোটেল

আলফ্রেডো। পৌঁছেই চিঠি দিতে বলেছিলাম আমরা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন চিঠি পাইনি। এখানকার কাজ শেষ হলেই আমরা প্যারিসে যাচ্ছি। তোমার কথা বলব ওকে।'

'প্রথম যখন দেখা হলো তখনই ওকে অস্বাভাবিক মনে হলো, না উৎকণ্ঠা ভাবটা পরে এসেছে ওর মধ্যে?'

'পরে। আমরা যখন পৌঁছলাম, স্টেশনে রিসিভ করল ও আমাদের। বরাবরের মত হাসি খুশি, ভাল মানুষ। কোথায় উঠেছে জিজ্ঞেস করায় বলল বন্ধুর বাসায়। কোন্ বন্ধু সেকথা আমরাও জিজ্ঞেস করিনি, ও-ও বলেনি। রাতে একসাথে ডিনার খেলাম বেশ হৈ-চৈ করে। পরদিন সকালে আসার কথা ছিল ওর, কিন্তু এল না। ওই সময়েই কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছিল খুব সম্ভব। তিনদিন আগে আমরা পার্টিতে যাওয়ার জন্যে বাইরে বেরোচ্ছি, এমনি সময়ে এসে হাজির হলো, চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা, ভয়। ওর চাপাচাপিতে বাধ্য হলাম আমরা ওকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে।'

'তারপর থেকে আর কোন সংবাদ নেই ওর?'

'না।'

'হোটেল আলফ্রেডোতে উঠেছে ও সেটা জানলে কি করে?'

'ও-ই বলেছে। আমরা এখান থেকে প্যারিস যাচ্ছি শুনে ওই হোটেলে দেখা করতে বলল।'

প্রসঙ্গটার ইতি টানল রানা। 'যাক, কপাল খারাপ, দেখা হলো না। আবার কবে যে দেখা হবে কে জানে।'

'টেলিফোনে কথা বলতে পারো,' বুদ্ধি দিল লুইসা। 'তোমার কথা শুনলে ও হয়তো চলেও আসতে পারে।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'একটা ফোন করব একসময়।'

চতুর্থ বারের মত আড়চোখে লক্ষ করল রানা গনডোলিয়ারের ঔৎসুক্য। হাঁ করে গিলছে ওদের সব কথা।

চটুল গল্পে মেতে গেল রানার এবার। হালকা রসিকতায় হেসে খুন হয়ে গেল লুইসা, ঢলে পড়ল রানার গায়ে। হাসতে হাসতে নামল ওরা গনডোলা থেকে। ছোকরা গম্ভীর।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল রানা ওকে, 'কিছু বলবে, বাতিস্তা?'

প্রবল ভাবে মাথা নাড়াল ছেলেটা। 'না।'

মোড়ে এসে থেমে দাঁড়াল লুইসা। কেটে পড়ার মতলব টের পেয়ে চোখ পাকাল রানা।

'খবরদার। কোর্টে নালিশ ঠুকে দেব কিন্তু।'

'ভয় নেই, পালাচ্ছি না। তুমি যাও লক্ষ্মী, আমি আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে। সিলভিওকে বলে আসি যে তোমার সাথে লাঞ্চ খাচ্ছি। নইলে হারিয়ে গেছি মনে করে মহা চিন্তায় পড়ে যাবে ও।'

চোখে চোখে চেয়ে হাসল দুজন।

গ্রিটি হোটেলের দিকে চলে গেল লুইসা। বাসার দিকে রওনা হলো রানা। ভাবল, ভালই হলো। এখুনি ট্রাঙ্ক-কলটা সেরে নেবে ও। অনিল সত্যি প্যারিসে আছে কিনা জেনে নেয়া দশ মিনিটের কাজ। যদি থাকে, ওর সঙ্গে কথা বলার পর পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করা যাবে। কিন্তু সত্যিই কি আলফ্রেডোতে পাওয়া যাবে ওকে? লুইসা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, যদি সত্যিই তিনদিন আগে প্যারিসে চলে গিয়ে থাকে অনিল, তাহলে গত রাতের এতসব ঘটনা কিসের জন্যে? ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে কেন? কেন খুন করা হলো জুলিকে?

এর একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে, আত্মগোপন করার প্রয়োজনে কৌশল অবলম্বন করেছিল অনিল। হয়তো আক্রমণ আসতে পারে ভেবেই লুইসা এবং সিলভিওকে নিয়ে গিয়েছিল স্টেশনে। ট্রেনেও উঠেছিল, কিন্তু পরের স্টেশনে নেমে আবার ফিরে গিয়ে লুকিয়ে

ছিল মনডেলো লেনের সেই ভাঙা বাড়িতে। এইভাবে শত্রুপক্ষের চোখে ফাঁকি দিয়ে ভেনিসেই থাকতে চেয়েছিল হয়তো অনিল। বেঁটে-মোটা আর সরু-লম্বার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই এই কৌশল? কিন্তু এ কৌশল দিয়ে ওদের চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব হয়নি অনিলের পক্ষে। ওরা বের করে ফেলেছে, জুলি মাযিনি জানে কোথায় লুকিয়ে আছে অনিল, ওর উপর নির্যাতন করে বের করে নিয়েছে ঠিকানাটা। তারপর ধরে ফেলেছে অনিলকে। নাকি পালিয়ে গেছে আবার অনিল?

ব্যান্ডেজের কথাটা মনে আসতেই পালাবার সম্ভাবনাটা নব্বই ভাগ বাতিল করে দিল রানা। ধরে নিতে হবে, ধরা পড়েছে অনিল, এখন বের করতে হবে, কাদের হাতে ধরা পড়ল। কারা এরা?

বাসায় পৌঁছে দেখা গেল ফেরেনি এখনও গিলটি মিঞা। রানা আশা করছে পুলিস নিশ্চয়ই যাবে জুলির কাজের জায়গায়, জিজ্ঞাসাবাদ করবে গিয়াকোমো পাসেল্লীকে, জানাজানি হয়ে যাবে জুলির মৃত্যুর খবর। ওর মৃত্যুতে ফ্যাক্টরি ছুটি হোক বা না হোক, সহকর্মিনীরা যে একবার জুলির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাবে সহানুভূতি জানাতে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের পিছু নেয়ার আশায় ঘুরঘুর করবে গিলটি মিঞা আশেপাশে কোথাও, চিনে আসবে বাড়িটা।

ভালই হলো। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে না এলেই বাঁচা যায়।

আট

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে ধরল রানা।

'আপনার প্যারিসের কল, সিনর। কথা বলুন।'

'ধন্যবাদ। হ্যালো, আলফ্রেডো হোটেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইয়েস, মশিয়ে। রিসেপশন ডেস্ক।' পরিষ্কার ইংরেজীতে উত্তর এল।

'আপনাদের ওখানে কি চ্যাটার্জী বলে কেউ উঠেছেন? মি.অনিল চ্যাটার্জী?'

'একটু ধরুন, দেখে বলছি।'

আধ-খাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিল রানা অ্যাশট্রেতে। চট্ করে টেনে নিল একটা ছোট্ট সাদা প্যাড, আর বলপেন। কয়েক সেকেন্ড পরই আবার শোনা গেল রিসেপশন ক্লার্কের কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো, মশিয়ে? হ্যাঁ, আমাদের এখানেই উঠেছেন মি. চ্যাটার্জী।'

ভুশ করে আটকে রাখা দম ছাড়ল রানা। লুইসার কথা বিশ্বাস করেনি ও, আশা করেছিল জবাব আসবে–না, মশিয়ে, মি. চ্যাটার্জী বলে কেউ ওঠেননি আমাদের হোটেলে। একটু যেন হকচকিয়ে গেল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'উনি আছেন?'

'খুব সম্ভব আছেন। ওঁর রুমে কানেকশন দেব?'

'দিন। বলুন মাসুদ রানা কথা বলতে চান ওঁর সঙ্গে।'

'জাস্ট আ মোমেন্ট, প্লীজ।'

দশ সেকেন্ড চুপচাপ, তারপর ক্লিক করে রিসিভার তোলার শব্দ হলো। পরিষ্কার বাংলায় ভেসে এল, 'হ্যালো? অনিল বলছি।'

দেড় বছর আগে সাত দিনের পরিচয়। কথাবার্তা তেমন কিছুই হয়নি, দুজনই ব্যস্ত ছিল কাজে। গল্পের বন্ধুত্ব নয়, কাজের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ওদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে। এত দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটা তাই চিনতে পারল না রানা। চিনবার কথাও নয়।

'আমি রানা বলছি,' বলল রানা। 'চিনতে পারছ, অনিল?'

খানিক চুপ, তারপর উত্তর এল, 'পারছি।'

'কেমন আছ, অনিল? বহুদিন পর, তাই না? কি বলো?'

'হ্যাঁ। বেশ অনেক দিন। দিন যায়, দিন আসে—কি দাম সময়ের? তা কোথায় আছ তুমি? কোথা থেকে বলছ?'

একটি শব্দও যেন শুনতে ভুল না হয় সেজন্যে ঠেসে ধরে আছে রানা রিসিভারটা কানের ওপর। কিন্তু উত্তরটা কেন যেন পছন্দ হলো না ওর। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া, কাটা কাটা কথা। সজীব প্রাণবন্ত নয়, কেমন মরা মরা। অস্বাভাবিক।

'ভেনিস থেকে,' বলল রানা। 'তোমার মায়ের একটা চিঠি আছে আমার কাছে। তোমাকে লেখা। উনি ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন তোমার জন্যে।'

'উদ্বিগ্ন? কেন?'

'কেন উদ্বিগ্ন সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছ তুমি?' রেগে গেল রানা। যার জন্যে এত কিছু, তার নিশ্চিন্ত কণ্ঠ বিরক্ত করে তুলেছে ওকে। 'সপ্তাহে দুটো করে চিঠি লেখার কথা, সে জায়গায় গত দেড় মাসে একটা চিঠি নেই...উদ্বিগ্ন হবে না মানুষ? এতই ব্যস্ত তুমি যে মাকে দুটো লাইন লেখার সময় হয় না?'

কোন জবাব নেই। দশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। প্যারিসের রাজপথে ব্যস্ত গাড়িঘোড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। মনে হলো দ্রুত শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনতে পেল সে আবছাভাবে।

'হ্যালো? লাইনে আছ তুমি, অনিল?'

'হ্যাঁ।' ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বর। 'কি যেন বলছিলে?'

'দেড় মাস কোন চিঠি না পেয়ে তোমার মা খুবই দুশ্চিন্তায় আছেন।' গলাটা একটু চড়িয়ে দিল রানা।

'দেড় মাস? নাহ্, এতদিন হবে কি করে? লিখেছিলাম তো! আমার মনে হচ্ছে চিঠি লিখেছি আমি।'

'পৌঁছে যেটা দিয়েছিলে সেটা ছাড়া আর একটা চিঠিও পাননি উনি তোমার। লেখোনি বলেই পাননি। কি নিয়ে এত ব্যস্ত তুমি, অনিল?'

'দেড় মাস...' কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল কণ্ঠস্বর। আবার চুপ। প্যারিসের রাজপথে চলমান একটা ফোক্সওয়াগেন গাড়ির হর্নের আওয়াজ ভেসে এল। বিরক্ত হয়ে আবার কথা বলতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় একটা আবছা শব্দ শুনে শির শির করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। মনে হলো ফোঁপাচ্ছে একটা পুরুষ কণ্ঠ। কাঁদছে অনিল!

'অনিল!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'কি হয়েছে তোমার? তুমি অসুস্থ?'

খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর ভাঙা গলায় উত্তর এল, 'জানি না। আমি...আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি, রানা। এখানে কেন আছি আমি জানি না। কি করছি আমি জানি না। দোহাই লাগে তোমার, রানা, বাঁচাও...বাঁচাও আমাকে!'

'দাঁড়াও অনিল, শোনো! আমি আসছি। যেখানে আছ সেখানেই থাকো তুমি। ঘাবড়িয়ো না, কোন চিন্তা নেই। অ্যালিটালিয়ার ফ্লাইট না থাকলে প্লেন চার্টার করব আমি লিডো এয়ারপোর্ট থেকে। পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব আমি তোমার কাছে। যেখানে আছ সেখানেই থাকো, অন্য কোথাও যেয়ো না। আর যাই ঘটে থাকুক না কেন, সহজ ভাবে গ্রহণ করো সেটাকে। সব ঠিক হয়ে যাবে, কিচ্ছু ভেবো না। বুঝেছ?'

'জলদি...জলদি এসো, রানা...আমি বোধহয় বাঁচব না, রানা!' ককিয়ে উঠল অনিল।

চট করে ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল রানার। ওভার অ্যাকটিং! রানার সতর্ক কান এড়াল না সেটা।

'এক্ষুণি আসছি আমি,' বলল রানা। জানালা দিয়ে দেখতে

পেল দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে লুইসা পিয়েত্রো এই বাসার দিকে। অদ্ভুত সুন্দর ছন্দ মেয়েটার চলায়। নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। 'কিচ্ছু ভেবো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আসছি আমি, কেমন? রাখলাম।'

মাউথপিসটা বাঁ হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে ডান হাতের নখ দিয়ে জোরে খড়খড় করে আওয়াজ করল রানা রিসিভারের গায়ে। যেন বন্ধুর বিপদে ব্যস্ত হয়ে নামিয়ে রাখল সে রিসিভার একটা কিছু ব্যবস্থা করবার জন্যে।

এয়ারপিস কানে চেপে ধরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা।

কাজ হলো কৌশলে। আবছা হাসির শব্দ শুনতে পেল রানা। একটা পুলকিত কণ্ঠস্বর ফরাসী ভাষায় বলল, 'শুধু টোপ না, বড়শি, ফাৎনা, এমন কি ছিপ পর্যন্ত গিলে ফেলেছে ব্যাটা!'

আরেকটা ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'শাট আপ! ইউ ব্লাডি সোয়াইন! রিসিভার নামাও!' ক্লিক করে কেটে গেল লাইন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছল রানা। আরাম করে সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল।

'আসতে পারি?'

উঠে দাঁড়াল রানা, হাত বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকে কেতাদুরস্ত আহ্বান জানাল।

'এসো, লা সিনোরিনা।' হাসল ওর মেয়ে ভুলানো হাসি। 'তোমারই অপেক্ষায় আছি।'

অবাক চোখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা লুইসাকে। 'এইটুকু সময়ের মধ্যে কাপড় বদলে ফেলেছ? অপূর্ব লাগছে কিন্তু।' এগিয়ে এসে চুম্বন করল রানা ওর ঠোঁটে, তারপর হাত ধরে নিয়ে এসে বসাল একটা সোফায়, নিজে বসল পাশে।

‘তোমার জন্যে খবর আছে।’

‘কি খবর?’ অবাক আয়ত চোখ মেলে ধরল লুইসা রানার চোখে।

‘আলফ্রেডো হোটেলে ফোন করেছিলাম। এই একটু আগে। কথা হয়েছে অনিলের সঙ্গে।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। ভয়ানক অসুস্থ মনে হলো ওকে। আজই দেখা করার জন্যে বায়না ধরেছে।’

‘যাচ্ছ তুমি?’

‘ভাবছি যাওয়া উচিত। তোমার কাছে যা শুনলাম, আর ওর সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম, মনে হচ্ছে যাওয়া উচিত আমার। আমার মনে হয় নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে ওর। শেষের দিকে রীতিমত ফোঁপাতে শুরু করেছিল।’

‘আহ্-হা! বেচারা!’

লুইসার কণ্ঠে সহানুভূতি ঝরে পড়ল। অভিনয়টা এতই আন্তরিক যে খুঁত ধরবার উপায় নেই। বহু কষ্টে হাসি চাপল রানা।

‘তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে?’ লুইসার একটা হাত তুলে নিল রানা নিজের হাতে। ‘নারীর সহানুভূতি অনেক উপকারে আসত ওর এই বিপদের সময়। যাবে?’

‘কিন্তু আজ আর কাল যে সিলভিওর দুটো বিজনেস পার্টি আছে। আমি না থাকলেই যে নয়।’

‘তাহলে অবশ্য জোর নেই। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না। ভেবেছিলাম ছুটির কটা দিনকে জীবনের স্মরণীয় দিন করে রাখব তোমাদের সাথে আনন্দে কাটিয়ে। বাধা পড়ে যাচ্ছে। যাব কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেও ইচ্ছে করছে না। স্বার্থপর হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। কি

করি বলো তো?'

'আমার মনে হয় তোমার যাওয়াই উচিত। বেচারা এই বিদেশে একা কষ্ট করছে, দেখার কেউ নেই, একটু সহানুভূতি দেখাবারও কেউ নেই। এখন না যাওয়াটা অমানুষের কাজ হয়ে যাবে।'

মনে মনে রানা বলল...ওরে ছুঁড়ি। এ দেখছি সোফিয়া লোরেনকেও হার মানাবে। মুখে বলল, 'ঠিক আছে। তুমি যদি বলো, যাব আমি। কিন্তু চিরকাল দুঃখ থেকে যাবে আমার মনে। কোনদিন ভুলতে পারব না ওকে সাহায্য করতে গিয়ে তোমাকে হারিয়েছিলাম আমি।'

'আমাকে হারাতে হবে কেন?' একটু যেন অবাক হলো লুইসা।

'বারে, হবে না? প্যারিস থেকে আর ভেনিসে ফিরে আসতে পারব মনে করেছ? অবস্থা ভাল দেখলে অবশ্য আমার এক সঙ্গীর সাথে ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে আসব আমি ভেনিসে। কিন্তু ওর অবস্থা যদি যা ভাবছি তাই হয়, তাহলে ওকে নিয়ে সোজা কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে তারপর নিস্তার পাব। তার মানে খুব সম্ভব আজই তোমার সাথে আমার শেষ দেখা।' কণ্ঠস্বরটা করুণ করে আনল রানা শেষের দিকে।

কাছে সরে এসে রানার কাঁধে মাথা রাখল লুইসা। এক হাতে রানার চুলে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, 'এসো আজকের দিনটাকেই ইতিহাস করে রাখা যাক। এই হঠাৎ দেখা, হঠাৎ ভাল লাগা, আর হঠাৎ বিচ্ছেদকেই আমাদের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা করে রাখি।'

বানানো কথা, কিন্তু শুনতে মন্দ লাগল না রানার। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। কত মিথ্যা, কত প্রবঞ্চনা, কত ভুল, আর কত মায়া রঙিন করে রাখে জীবনটাকে। কোনটাই মূল্যহীন নয়।

আর একটু সরে এল রানা, আর একটু কাছে টেনে নিল ওকে। আদরে আদরে বুজে এল লুইসার চোখ।

রানার কানের লতিতে আস্তে একটা কামড় দিল লুইসা।

'কখন যাচ্ছ?'

'লিডো থেকে একটা এয়ার-ট্যাক্সি চার্টার করব। রওয়ানা হব ঠিক দুটোর সময়।'

এই খবরটুকুর জন্যেই মেয়েটার এখানে আগমন, রানা জানে। ওকে ভেনিস থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে এরা। রানা যে সত্যিই আজ প্যারিস রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ খবরটা শুনে একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল লুইসার চোখে মুখে। নিশ্চিন্ত হয়ে এবার দিনটা স্মরণীয় করে তোলার চেষ্টায় মন দিল। বিচ্ছেদের কথা ভেবে উথলে উঠল ওর প্রেম।

একসময় উঠে গিয়ে দ্রুতহাতে সবকটা জানালার কার্টেন টেনে দিল ওরা। আবছা আঁধার হয়ে গেল ঘরটা। পায়ে পায়ে চলে এল খাটের কাছে। ভুলে গেল স্থান, কাল, পাত্র।

কখন যে নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকেছিল গিলটি মিঞা, আধ হাত জিভ কেটে 'না আউযুবিল্লা' বলে ছুটে পালিয়ে গেছে, টেরও পেল না কেউ।

ঠিক একটার সময় বাইরে থেকে লাঞ্চ খেয়ে আবার ফিরে এল ওরা আঁধার ঘরে।

'তোমাকে কোনদিন ভুলতে পারব না আমি, রানা।'

'আমিও না।'

'মিথ্যে কথা বললে। কতজন এসেছে তোমার জীবনে, আরও কত আসবে, আমি হারিয়ে যাব তাদের ভিড়ে।'

'তোমার জীবনে যারা আসবে, আমি হারাব তাদের ভিড়ে।'

'না।' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে রানার ঠোঁটে আলতো করে চুমো খেলো লুইসা। 'এই প্রথম জানলাম, সত্যিকার প্রেম কাকে

বলে। বিশ্বাস করো, জানতাম না আমি। আরও কয়েকজন পুরুষ এসেছে আমার জীবনে, আজ বুঝতে পারছি, তারা সবাই স্বার্থপর। তোমাকে হারাতে হবে ভাবতে সত্যিই খারাপ লাগছে এখন।'

জবাব দিল না রানা। কথাটা বিশ্বাস করবে কি অবিশ্বাস করবে তা নিয়ে ভাবল না একটিবারও। এ মেয়ে শত্রুপক্ষের মেয়ে। জুলি মাযিনির নির্মম হত্যার পিছনে হাত আছে এরও–জেনে হোক, না জেনে হোক, একটি জীবনের নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তির জন্যে দায়ী লুইসাও।

রানার প্রশস্ত বুকে মাথা রাখল লুইসা। 'না যদি পাও? যদি গিয়ে দেখো আলফ্রেডো হোটেল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে অনিল, তাহলে? তাহলে আবার ফিরে আসবে আমার কাছে?'

'আসতে পারলে সুখী হতাম লুইসা। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে খুঁজে বের করতে হবে আমার ওকে। যেমন করে পারি। কিন্তু সে প্রশ্ন আসছে কেন? ওই হোটেলেই থাকতে বলেছি ওকে, ওখানেই পেয়ে যাব।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল লুইসা। 'আমার সব কথাই তো শুনেছ, এবার তোমার কথা কিছু বলো। ঠিক কি ধরনের বিজনেস করো তুমি? প্রত্যেক বছরই বিদেশে আসতে হয়?'

ইনডেন্টিং ব্যবসার বানানো গল্প শোনাল রানা সবিস্তারে। বলল আগামীবার যখন ইউরোপে আসবে তখন যেমন ভাবে হোক খুঁজে বের করবে লুইসাকে। আবার মিলবে দুজন, আবার ভালবাসবে।

ঘড়ি দেখল রানা। এতক্ষণ কি করছে গিলটি মিঞা? এই মেয়ের কাছ থেকে যতটা জানার জেনে নিয়েছে সে, এখন দূর হলেই বাঁচে। কিন্তু সাপের সম্মোহনে আটকা পড়া ব্যাঙের মত নড়তে পারছে না মেয়েটা। সোয়া একটা বাজতেই উঠে বসল

রানা বিছানায়।

'সময় নেই হাতে। প্যাক করে তৈরি হয়ে নিতে হবে আমাকে দুটোর মধ্যে।'

'চলে যেতে বলছ?' করুণ দৃষ্টিতে চাইল লুইসা রানার চোখে।

'না, সিনোরিনা। আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।'

'আর পনেরোটা মিনিট দেবে না আমাকে?' কাঙালের মত মাথা নাড়ল লুইসা। 'প্লীজ, রানা।'

রানা হাসতেই কৃতার্থ হয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লুইসা রানার বুকে। চুমোয় চুমোয় ভরে দিল সারা গা।

'জীবনে কারও জন্যে কাঙালেপনা করিনি আমি, রানা। বিশ্বাস করো। চলে যাবে মনে করলেই নিজেকে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত মনে হচ্ছে। উহ্, কি করে বোঝাব তোমাকে আমার মনের অবস্থাটা?'

মিনিট দশেক চুপচাপ। তারপর ঝড়ের বেগে নিঃশ্বাস। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লুইসা। দুই হাতে চোখ ঢেকে কাঁদল ঝরঝরিয়ে। অবাক চোখে দেখল রানা মেয়েটাকে।

দু'মিনিটেই সামলে নিয়ে উঠে বসল লুইসা খাটের ধারে। ব্যস্ত হাতে জামা ঠিক ঠাক করল। হাতের পোঁছায় চোখ মুছল বার কয়েক। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল রানার সামনে। রানার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের গালের ওপর চেপে ধরল।

'ভায়া খণ্ডিওস্, মাই ডার্লিং, ভায়া খণ্ডিওস্।'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল লুইসা। রানার হাত ছেড়ে দিয়ে হ্যান্ড-ব্যাগটা তুলে নিল সাইড টেবিলের ওপর থেকে। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানার দিকে।

রানা দেখল, কোরবানির ছাগল জবাইয়ের আগের রাতে যেমন কাঁদে, তেমনি নিঃশব্দে কাঁদছে লুইসা পিয়েত্রো। দরদর

করে জল ঝরছে চোখ থেকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অব্যক্ত ব্যথায় গোঙাচ্ছে ওর ভিতরটা।

চলে গেল লুইসা পিয়েত্রো।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা। এ কি করল সে? খেলা খেলা মজা করতে গিয়ে এ কী কাণ্ড বাধিয়ে বসল? খেলাতে গিয়ে নিজের জালে আটকে গেছে লুইসা পিয়েত্রো, অন্য কোন পরিস্থিতি হলে প্রাণ ভরে হাসত রানা, কিন্তু কেন যেন হাসি তো এলই না, কেমন একটা টনটনে ব্যথা অনুভব করল সে বুকের ভিতর।

একেই বুঝি মোহ বলে? রানা জানে, প্রেম নয়—মোহে পড়েছে মেয়েটা। কিন্তু এরও দাম আছে, জীবনের চলার পথে এটাও তুচ্ছ করবার ব্যাপার নয়। কোনকিছুই ফেলনা নয়। এসব মানুষেরই মনের অভিব্যক্তি। এখন এটাই সত্য।

হ্যাঁ। এ কান্নায় কোন ভেজাল নেই। অন্তর থেকেই আসছে এটা।

মাথা ঝাড়া দিল রানা। কেটে যাবে। কেটে যাওয়ার জন্যেই আসে মোহ। কিন্তু যদি কোনদিন প্রয়োজন হয়, এ মেয়েটার বুকে ছুরি ঢোকাতে পারবে ও? লুইসা পারবে ওর কপাল লক্ষ্য করে পিস্তল ছুঁড়তে? মানুষের সব কিছুতেই কী আশ্চর্য জটিলতা! প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে রানাকে বাঁদর নাচ নাচাতে এসেছিল মেয়েটা। দলের নেতা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানাকে ভেনিস থেকে তাড়াতে হবে, এখানে রানার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়, তাই একে পাঠানো হয়েছে রানাকে ভুল পথে পরিচালনা করবার জন্যে। কর্তব্য সম্পাদন করেছে মেয়েটা, করতে গিয়ে আটকে গেছে মোহ জালে। এর কোনও ওষুধ নেই। জীবনের এ এক বিচিত্র খেলা। এ খেলার আদি অন্ত বুঝতে পারে না রানা।

খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল গিলটি মিঞা।

'কোতাউ চললেন নাকি আবার?'

'হ্যাঁ। এসো। খোঁজ বের করতে পারলে?'

'নিচ্চয়। আমি হাত দিয়েচি, কিন্তুক হোইনি, কোন্ কাজটা আচে বলুন? একেবারে নাড়ী-নক্ষত্ত, সব বিত্তান্ত নিয়ে এসেচি। বাপের সাথে থাকত মেয়েটা। ল্যাংড়া বুড়ো। ছোট এক ভাই আচে।'

'থাকে কোথায়?'

'ফনডামেন্ট নোভে ওটিভিয়ানি রেস্তোরাঁর কাচেই ওদের একটা ছোট্ট বাসা আচে। দশ নম্বর বাড়ি।'

'বাপটা জানে যে মেয়ে মারা গেছে?'

'জানে। মাচির মত ভ্যান ভ্যান করছে পুলিস ওর চারপাশে। একেবারে পাথর হয়ে গেচে বুড়ো। মেয়ের আয়েই চলত সংসার। একোন্ আর উপার্জনের কেউ রইল না।'

'ওটিভিয়ানি রেস্তোরাঁটা ঠিক কোথায়?'

'রিও ডি প্যানাডার কাচে। চলুন না, যকোন বলবেন নিয়ে গিয়ে হাজির করব।'

'না। আমার একাই যেতে হবে। তুমি আজ প্যারিস চলে যাচ্ছ।' গিলটি মিঞার চোখ বড় হয়ে যেতে দেখে হাসল রানা। 'আমিও যাচ্ছি। পড়ুয়া পর্যন্ত। বসো, বলছি সব।'

রানাকে জিনিসপত্র গোছগাছ করে সুটকেসে তুলতে দেখে এগিয়ে এল গিলটি মিঞা।

'আমাকে দিন, স্যার। আমি গুচিয়ে দিচ্চি।'

'তুমি বসো ওই সোফায়। যা বলি মন দিয়ে শোনো।'

বসল না কিছুতেই গিলটি মিঞা। বলল, 'ধরে নিন বসেই আচি। বলুন, শুনচি মন দিয়ে।'

আজকের ঘটনা আগাগোড়া সবটা বলল রানা। চুপচাপ শুনে গেল গিলটি মিঞা, একটি কথাও বলল না। রানার বক্তব্য শেষ

হতে প্রথমে নাক চুলকাল, তারপর কান চুলকাল, তারপর মাথার পেছনটা।

'এই যদি অবস্তা হয়, তাহালে আর বেহুদা যাচ্চি কেন?'

'বলছি। আগে কি করতে হবে শুনে নাও। তুমি আলফ্রেডো হোটেলে গিয়ে খোঁজ করবে অনিলের। আমার যতদূর বিশ্বাস, কাউকে পাবে না ওখানে। কিন্তু যদি পাও,' পকেট থেকে অনিলের ছবি বের করে দিল রানা, 'এই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবে। ছবিটা মিলে গেলে ওকে বলবে জরুরী তার পেয়ে আমি লন্ডনে চলে গিয়েছি, প্যারিসের চাথাম হোটেলে একটা স্যুইট ভাড়া করে থাকতে বলেছি তোমাদের দুজনকে, আমি আসছি আগামীকাল সন্ধ্যায়। যদি চেহারা না মেলে তাহলে ওদের বুঝতে দেবে না যে তুমি কিছু টের পেয়েছ, বলবে, জরুরী তার পেয়ে আমাকে লন্ডন চলে যেতে হয়েছে, দিন সাতেক পরে দেখা করব ওর সঙ্গে, তোমাকে পাঠিয়েছি ততদিন ওকে ওই হোটেলেই থাকবার অনুরোধ জানাবার জন্যে।'

'আর যদি কাউকে না পাই?'

'তাহলে ছবিটা দেখাবে রিসেপশন ক্লার্ককে। অনিলকে চিনতে পারে কিনা দেখবে। আমার মনে হয় পারবে না। সঠিক খবরটা জানা দরকার আমার।'

'আর ইতিমধ্যে এরা মনে করবে যে আপনি এ শহর ছেড়ে চলে গেচেন, অতচ নুকিয়ে নুকিয়ে এদের কাজকম্মো দেকবেন। এই তো?'

'ঠিক বলেছ, ওদের কাজকর্মও দেখব, নিজের কাজকর্মও করব। লিডো থেকে এয়্যার-ট্যাক্সি ভাড়া করব আমরা। ওখানে এদের লোক নজর রাখতে পারে, কাজেই আমিও উঠব তোমার সঙ্গে প্লেনে। পডুয়ায় নেমে ফিরে আসব আমি এখানে ছদ্মবেশে। সারাগাত হোটেলে উঠব। ওখানেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ

করবে তুমি ।'

'আর এই বাড়িটা?'

'সাতদিনের ভাড়া দেয়া আছে, আমরা ফিরে তো আসছিই, তাছাড়া মালপত্রও সব নিচ্ছি না । ক্ষতি কি, থাকুক এটা পাঁচদিন খালি পড়ে ।'

'আরাকটা কতা । টাকা আসচে কোত্থেকে? আপনার কাচে যা আচে সে তো পেলেন্ ভাড়া করতেই...'

'ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না, গিলটি মিঞা । সারাগাত ক্যাসিনোতে জুয়ো খেলব দরকার হলে ।'

যে কোন ধরনের জুয়া খেলায় রানার আশ্চর্য ভাগ্যের কথা জানা আছে গিলটি মিঞার । তাই বিনা দ্বিধায় মেনে নিল রানার বক্তব্য । টাকার চিন্তা দূর হলো ।

'এবার তোমার মালপত্র গুছিয়ে নাও । আমি ফোন করি এয়ারপোর্টে ।'

নয়

জেটিতে ভিড়ছে ভ্যাপোরেটো । সান যাকারিয়া জেটি ।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একহারা চেহারার এক ঈজিপ্শিয়ান ট্যুরিস্ট । গাঢ় নীল রঙের আধ-পুরানো স্যুট, মাথায় কালো ডেনহাম হ্যাট, গাল ভর্তি সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি, পিঠে বাঁধা একটা ক্যানভাসের রাকস্যাক । অবাক চোখে দেখছে সে ভেনিস নগরীর অপরূপ সান্ধ্য-সৌন্দর্য ।

জনা ছয়েক আমেরিকান ট্যুরিস্টের পেছন পেছন নেমে এল রানা । এ বেশে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবও চিনতে পারবে না ওকে । এখন ও পদব্রজে পৃথিবী পর্যটনরত এক ঈজিপশিয়ান যুবক ।

ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল রানা । সান মার্কো পেরিয়ে

হাঁটছে সে সান মারিয়া ফরমোজার দিকে।

হঠাৎ আঁৎকে উঠল রানা ডানপাশের একটা গলি দিয়ে সাদা হ্যাট, সাদা স্যুট পরা লম্বা লোকটাকে বেরিয়ে আসতে দেখে। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার নিরুৎসুক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল লোকটা। চিনতে পারেনি।

হাঁপ ছাড়ল রানা। সামান্য একটু কমিয়ে দিল চলার গতি, হাঁটতে থাকল লোকটার পিছু পিছু। মোড়ের কাছে একটা মদের দোকানে ঢুকল লোকটা। দরজার কাছাকাছি বসল একটা টেবিলে। রানা এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে, ট্যুরিস্টসুলভ ইতস্তত করল একটু, তারপর ঢুকে পড়ল দোকানের ভিতর।

সাদা হ্যাট পরা লোকটা মুখ তুলে দেখল রানাকে, তারপর কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েটাকে ইশারা করল কাছে আসার জন্য। কাছাকাছিই একটা টেবিলে বসল রানা।

মেয়েটা কাছে আসতেই অস্বাভাবিক জোরে বলে উঠল রানা, 'ভিনো রোজ। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে গেল মেয়েটার, বিদেশী বলে মাফ করে দিল, মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল সামনের লোকটার কাছে। এক বোতল হোয়াইট শিয়ান্টি চাইল লোকটা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল রানা।

রানার টেবিলে একটা বোতল আর গ্লাস নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটা সাদা হ্যাট পরা লোকটার টেবিলের দিকে।

'ইল সিনর গীয়ান এসেছিল আজ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'আসার কথা ছিল।'

'না তো। আসেননি আজ।'

একটা সিগারেট ধরাল লোকটা। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইল বোতলটার দিকে।

রাকস্যাক থেকে আল আহরামের একটা কপি বের করে চোখের সামনে মেলে ধরল রানা। মনোনিবেশ করল পড়ায়। গীয়ান কে? মোটা লোকটা?

বোতলটা আধাআধি খরচ হওয়ার আগেই একটা ছায়া পড়ল দরজার কাছে, ভেতরে ঢুকল কালো হ্যাট ও স্যুট পরা বেঁটে মোটা লোকটা। তাহলে এই ব্যাটাই গীয়ান। চট করে সরে এল রানার দৃষ্টি আবার কাগজের ওপর।

'দেরি হয়ে গেল, ওড্ডি।' একটা চেয়ার টেনে নিল গীয়ান, বসে পড়ল ধপাস করে। 'ঘাড়টা এখনও যা টনটন করছে না! নড়াতে পারছি না।'

'গুলি মারো তোমার ঘাড়। ঘাড়ের নিকুচি করেছি আমি। আমার চোয়ালটা তোমার ঘাড়ের চেয়ে কম ব্যথা পায়নি, সেই চোয়াল নিয়ে পনেরো মিনিট ধরে অপেক্ষা করছি আমি তোমার জন্যে।'

'তুমি মার খেয়েছ তোমার নিজের দোষে।'

'আর তুমি খেয়েছ পরের দোষে, নাকি?'

চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেল গীয়ানের, হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'পেয়ে নিই শালাকে! আর একটাবার!'

'তোমার জন্যে ঘাড় পেতে বসে আছে তোমার শালা। খোঁজ খবর রাখো না কিছু? দুপুরে চলে গেছে ব্যাটা প্যারিসে।'

'আসবে তো আবার। ঠক খেয়ে ফিরবে না? তখন...' দাঁতে দাঁত চাপল মোটা। ফুলে উঠল চোয়ালের শক্ত পেশী।

'তোমার আর শোধ নেয়া হবে না, চাঁদ। ও ফিরতে ফিরতে আমরা আমাদের কাজ শেষ করে ফিরে যাব দেশে।' হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল ওড্ডি। 'চলো ওঠা যাক। কাজ পড়ে রয়েছে।'

ঘাড়টাকে কষ্ট না দিয়ে কোমর থেকে ওপরের অংশটা ঘুরিয়ে রানার দিকে চাইল গীয়ান। পত্রিকার গায়ে আরবী আঁকিঝুঁকি দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সোজা হয়ে বসল। 'দাঁড়াও, কয়েক ঢোক খেয়ে যাই।'

'উঁহুঁ, উঠে পড়ো। সময় নেই।'

উঠে পড়ল দুজন, বাঁ দিকে চলে গেল ওরা হাঁটতে হাঁটতে।

ওরা চোখের আড়াল হতেই বিল চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল রানা। চারপাশে চাইতে চাইতে এগোল সে ওদের পিছু পিছু। সামনের মোড়ে পৌঁছে দেখতে পেল রানা ওদের। একটা দোতলা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তালায় চাবি লাগিয়েছে লম্বা লোকটা, অর্থাৎ ওড্ডি।

একটু আড়ালে সরে গেল রানা। সবুজ পেইন্ট করা একটা দরজা খুলে গেল। ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জন। বাড়ির নম্বরটা পড়ল রানা—২২/এ, ক্যাম্পো ডি সালিযো। কাছাকাছি গিয়ে বাড়িটা ভাল করে পরীক্ষা করবার ইচ্ছেটা দমন করল সে। দোতলার কোন দরজা দিয়ে কেউ ওকে দেখে ফেললে ছদ্মবেশ ধরার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ওটিভিয়ানি রেস্তোরাঁর দিকে হাঁটতে শুরু করল রানা গিলটি মিঞার নির্দেশিত পথে।

রিও ডি প্যানাডা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। জমজমাট ওটিভিয়ানি রেস্তোরাঁ পেরিয়ে এগিয়ে গেল রানা দুপাশের বাড়ির নম্বরগুলো পড়তে পড়তে।

একটা হুইল চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে আছে কুরিযো মাযিনি। ঘরের চারপাশে একনজর চোখ বুলিয়েই বুঝল রানা, নেহাত গরীবি চালে সংসার চালাতে হত জুলিকে। পাসেল্লী গ্লাস ফ্যাক্টরিতে নিশ্চয়ই তেমন কিছু বেতন পেত না মেয়েটা।

কোনমতে কায়ক্লেশে চলত সংসার। ঘরে আসবাবের মধ্যে খটখটে দুটো চেয়ার, আর একটা পুরানো আমলের ডবল-বেড খাট।

পাথরের মত বসে আছে কুরিযো মাযিনি। কঠোর একটা ভাব ফুটে রয়েছে ভাঁজ পড়া হলুদ মুখে, কপালে। সব আশা ভরসা নির্মূল হয়ে গেলে মানুষ যেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায় দুনিয়ার সব কিছুর ওপর, তেমনি একটা ভাব বৃদ্ধের চোখের স্থির দৃষ্টিতে।

রানার মুখের দিকে নিশ্চলক চেয়ে রইল বৃদ্ধ কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, 'আজ আমাকে মাফ করতে হবে, সিনর। কোন অভ্যর্থনা করতে পারব না আমি আজ আর। মেয়েটা মারা গেছে। আপনারা কি একটু নিরিবিলিতে থাকবারও সুযোগ দেবেন না আমাকে?'

কঠোর তিরস্কার শুনে একটু হকচকিয়ে গেল রানা প্রথমটায়। তারপর আমতা আমতা করে বলল, 'আপনার মেয়ের মৃত্যুর ব্যাপারেই এসেছি আমি। কিভাবে মারা গেল জুলি সে ব্যাপারে কিছুটা জানি আমি। আপনাকে জানানো দরকার বলে মনে করলাম।'

'কে আপনি? পুলিসের লোক?'

'না, আমি পুলিসের লোক নই। আমার নাম মাসুদ রানা। আমার নাম হয়তো আপনার মেয়ের মুখে শুনে থাকবেন...'

'মিথ্যে কথা!' প্রায় গর্জন করে উঠল একজন পাশের ঘর থেকে। পর্দা সরিয়ে ঢুকল এঘরে। 'মিথ্যে কথা বলছে লোকটা, বাবা। আমি চিনি ইল সিনর মাসুদ রানাকে। এ লোক সে লোক নয়।'

রানা দেখল ঘরে ঢুকল ঝাড়া সোয়া ছ'ফুট লম্বা গনডোলার সেই বডি-বিল্ডার ছোকরা মাঝি। আধ হাত লম্বা একটা ছোরা ওর হাতে। ঘরের ঠিক এমন জায়গায় এসে দাঁড়াল যেখান থেকে এক

লাফে রানার ঘাড়ে পড়া যাবে যদি ও পালাবার মতলব করে।

'আমি কিন্তু তোমাকে চিনতে পারছি, বাস্তিতা।' হাসল রানা। 'সকালে অবশ্য জানতাম না যে তুমিই জুলির ভাই। আমার গলা শুনে চিনতে পারছ না এখনও?'

কটমট করে চেয়ে রইল ছেলেটা রানার মুখের দিকে।

'না। চিনতে পারছি না!' সন্দেহ ফুটে উঠল ওর চোখে।

'বেশ তো, আমার দু'চারটে কথা শুনলেই চিনতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু তার আগে বসতে পারি?'

'বসুন।' সতর্ক প্রহরায় রইল বাতিস্তা।

বৃদ্ধের দিকে ফিরল রানা। 'আচ্ছা, অনিল চ্যাটার্জীকে চেনেন তো?'

সচকিত হয়ে ছেলের দিকে চাইল একবার বৃদ্ধ।

'নামটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে কি?'

'অনিল আমার বন্ধু। এই ভেনিসে নিখোঁজ হয়েছে সে। গতকাল আমি এসেছি এখানে ওর খোঁজে। অনিলের মা আমাকে বলেছিলেন গিয়াকোমো পাসেল্লীর দোকানে কাজ করে জুলি মাযিনি বলে এক মেয়ে, তার কাছে অনিলের খোঁজ পাওয়া সম্ভব। কাল সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম ওই দোকানে। আপনার মেয়ে আমাকে চিনতে পেরে অনিলের নাম দিয়ে একটা কাঁচের ডিজাইন তৈরি করে ধরল আমার চোখের সামনে এমন ভাবে, যেন আর কেউ দেখতে না পায়। আমি বুঝতে পারলাম ও ওই দোকানে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ফ্লোরিয়ানের সামনে দেখা হলো আমাদের। কিন্তু ততক্ষণে আমার পেছনে গীয়ান আর ওড্ডি নামে দুই জন লোক লেগে গেছে, আমি টের পাইনি। আমাকে একটা গলিতে নিয়ে গেল জুলি, আমি আমার পরিচয় দিতেই ৩৭ নম্বর মনডোলো লেনে যেতে বলল। আর বেশি কিছু বলবার আগেই গীয়ান এসে হাজির হলো,

অপ্রস্তুত অবস্থায় মেরে অজ্ঞান করে ফেলল আমাকে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমি ওই ঠিকানায় গিয়ে হাজির হলাম। অনিলকে পেলাম না, আপনার মেয়েকে পেলাম হাত-পা বাঁধা, মৃত।'

হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে চোখ বুজল বৃদ্ধ। ক্ষোভে দুঃখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল বাতিস্তার মুখের চেহারা। এই ভয়ঙ্কর দুঃখের খবরটা সহ্য করে নেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ সময় দিল রানা ওদের। সিগারেট বের করে ধরাল। আধমিনিট পর চোখ খুলল বৃদ্ধ।

'থামলেন কেন। বলুন। আরও কিছু বলবেন, সিনর?'

'আর বিশেষ কিছুই বলবার নেই। সেই থেকে আমার গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে। আজ সকালে স্ট্যাচু দেখতে যাচ্ছিলাম, জুটে গেল একটা মেয়ে। আমাকে ভেনিস থেকে অন্যখানে সরাবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল মেয়েটাকে। ও আমাকে মিথ্যে সংবাদ দেয় যে তিনদিন আগে অনিলকে প্যারিসের পথে ট্রেনে তুলে দিয়েছে। যে হোটেলের ঠিকানা বলল সে হোটেলে ফোন করে কথা বললাম আমি অনিলের সঙ্গে।'

'অনিল চ্যাটার্জীর সঙ্গে?' নিজের অজান্তেই জিজ্ঞেস করে বসল বাতিস্তা।

'নকল অনিলের সাথে। আমি ওদের বুঝতে দিলাম না যে টের পেয়ে গেছি ব্যাপারটা। অনিলের আহ্বানে আজ দুটোর সময় রওনা দিলাম আমি প্যারিসে, এয়ার-ট্যাক্সি চার্টার করে উঠলাম তাতে। পড়ুয়ায় নেমে ফিরে এসেছি আমি আবার। আমার তথ্য দরকার। শুধু যে অনিলকে উদ্ধার করতে চাই তা নয়, জুলির নির্মম হত্যার প্রতিশোধও নিতে চাই আমি। কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন আমাকে?'

লম্বা দুই পা ফেলে এগিয়ে এল বাতিস্তা, নিচু হয়ে ঝুঁকে পরীক্ষা করল রানার মুখ, তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে চিনতে পারছি এবার। ছদ্মবেশ নিয়েছেন আপনি, সিনর মাসুদ রানা।

ছুরিটা কোমরে গুঁজে রাখল সে কথাটা বলতে বলতে।

'নিতে বাধ্য হয়েছি। বসো, বাতিস্তা। আজ সকালে গনডোলায় কি যেন বলতে চেয়েছিলে তুমি আমাকে। কি সেটা?'

'যা বলতে চেয়েছিলাম তা আপনি নিজেই বের করে নিয়েছেন। বলতে চেয়েছিলাম, হয় মিথ্যে নয় ভুল কথা বলছেন ভদ্রমহিলা।'

'বলোনি কেন?'

'ভরসা পাইনি। সিনোরিনার সাথে আপনার যে রকম মাখামাখি দেখলাম, তাতে আর...'

'বুঝতে পেরেছি। বৃদ্ধের দিকে ফিরল রানা। 'আপনার সাহায্য দরকার আমার, সিনর মাযিনি।'

'আমি কি করে সাহায্য করব আপনাকে? খোঁড়া মানুষ। নড়তে পারি না। যদি পারতাম, আমার কাছে সাহায্য চাইতে হত না আপনার।'

'আমি সাহায্য করব আপনাকে,' বলল বাতিস্তা। 'জুলির হত্যাকারীকে নিজ হাতে খুন করতে না পারলে ঘুম আসবে না আমার চোখে।'

'মেয়েটা গেছে, ছেলেটাও যাবে,' উদাস কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ। 'সবই শেষ হয়ে যাবে আমার। কিন্তু তাই বলে ওকে বারণ করবার উপায় আমার নেই। ওর বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই হবে ওকে, সিনর মাসুদ রানা। আমি সক্ষম হলে আমাকেও আটকাতে পারত না কেউ। কি করব, পোড়া কপাল, ল্যাংড়া হয়ে গেছি। বুড়ো বয়সে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে এ বাড়ি ও বাড়ি।'

'মরব না, বাবা। এখনও সেই ছোটটি আছি মনে করো কেন তুমি?' রানার দিকে ফিরল। 'জানেন সিনর, জুলিও তাই মনে করত। কিছুতেই কাজে লাগতে দেয়নি আমাকে। জোর করে ভর্তি করে দিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। কি কষ্টই না করত বেচারী!

কোনরকমে কায়ক্লেশে চালাত সংসার, কিন্তু জানেন, আজ পর্যন্ত এক মাসের বেতনও বাকি পড়েনি আমার।' গলাটা কেঁপে গেল বাতিস্তার। 'বলত, লক্ষ্মী ভাইয়া আমার, জেদ করে না, বাবার মত বিরাট পণ্ডিত হতে হবে তোমাকে। ও নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে ওর দুষ্টু ভাইয়া নাম লিখিয়েছে আজ গনডোলা স্টেশনে। ওর আত্মাটা নিশ্চয়ই কেঁদে কেঁদে...'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বাতিস্তা। মুখ ঢাকল দুহাতে। ওর বাহুতে হাত রাখল রানা। দেখতে দেখতে রানারও দুচোখ বেয়ে নামল ঢল। আটকাতে পারল না কিছুতেই। অবাক হয়ে চেয়ে রইল বৃদ্ধ রানার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল ওর শুকনো, কঠোর চোখ দুটো। তারপর তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে মুখ ঢাকল সে-ও। সারাদিন এক ফোঁটা কাঁদতে পারেনি বৃদ্ধ, পাথরের মত জমে গিয়েছিল, বিদেশী এক যুবকের সমবেদনায় পাথর গলে নামল ঝর্ণা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বাচ্চা ছেলের মত।

'কি সাহায্য চাও তুমি, সিনর?'

'কিছু তথ্য। আপনি জানতেন আপনার মেয়ের সাথে পরিচয় ছিল অনিল চ্যাটার্জীর?'

'জানতাম। ওরা ভালবাসত পরস্পরকে।'

'অনিল কি এখন ভেনিসে?'

'খুব সম্ভব,' বলল বৃদ্ধ। পালিয়েও গিয়ে থাকতে পারে। তবে আমার মনে হয় সেটা সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে।'

'কেন? ও কি জখম হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। গুলি খেয়েছিল। বাঁ কাঁধে। শরীরের মধ্যে রয়ে গেছে গুলিটা।'

'গুলি খেয়ে সাহায্যের জন্যে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। সতেরো দিন আগে। আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ। বাতিস্তা এক্সকারশনে গিয়েছিল, বাড়িতে আমি আর জুলি ছাড়া কেউ নেই। এঘরে এল জুলি, ওকে বারণ করলাম দরজা খুলতে। ততক্ষণে আর টোকার শব্দ নেই, মনে হচ্ছে কে যেন আঁচড়াচ্ছে দরজার গায়ে নখ দিয়ে। হয়তো মনটা আগাম দিয়েছিল, বারণ শুনল না জুলি, খুলল দরজা। হাতের কাছে কোন অস্ত্র পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করছি, এমন সময় দেখলাম অনিলকে ধরে নিয়ে আসছে জুলি ঘরের ভেতর। ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল অনিল, প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে একেবারে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ার আগে কোন মতে বলল, ওর পিছু ধাওয়া করে লোক আসছে, ওকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখেও থাকতে পারে। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল জুলি, কোনমতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ওকে পাশের ঘরে, শুইয়ে দিল ওর বিছানায়। সাত-আট দিনের ক্ষত, ইনফেকশন মত হয়ে গেছে। ক্ষতটা ড্রেসিং করতে শুরু করল জুলি, আমি জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রেখে বসে রইলাম। দুজন লোককে দেখতে পেলাম এইদিকেই আসছে। এক জন লম্বা, অপরজন খাটো। এ বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল লোকদুটো, বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।'

'ওদের একজনের মাথায় সাদা হ্যাট ছিল?'

'ছিল।' মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ।

'ওরা দুজনই খুব সম্ভব খুন করেছে আপনার মেয়েকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'জানি। আঁচ করতে পারছি। শাস্তি হবে না ওদের, সিনর?'

'হবে। এ নিয়ে ভাববেন না আপনি।' রানার মুখে দৃঢ় সংকল্প দেখতে পেল বৃদ্ধ। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করল রানা কিছুক্ষণ,

তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'কতদিন ছিল ও এখানে?'

'একদিন। তাও কি থাকতে চায়? জখমটা ধুয়ে ড্রেসিং করে খানিকটা গরম দুধ খাওয়াতেই কিছুটা শক্তি ফিরে পেল অনিল। একটু সুস্থির হয়ে যখন বুঝতে পারল কতবড় বিপদের মধ্যে ফেলতে যাচ্ছে ও আমাদের, তখুনি চলে যাওয়ার জন্যে জেদ ধরল। পরদিন রোববার ছিল। অনেক বলে কয়ে সেদিনটা এখানে থাকতে রাজি করাল ওকে জুলি। সারাদিন খুঁজে পেতে কিছুদিন লুকিয়ে থাকার মত একটা জায়গা বের করে ফেলল, রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল ওরা।'

'কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলেনি ও আপনাদের?'

'জুলিকে বলেছিল কিনা আমি জানি না। আমি জিজ্ঞেস করিনি। যেটুকু এমনিই জানতে পেরেছিলাম তা হচ্ছে, মস্ত বিপদে পড়েছে ও, একটা সংঘবদ্ধ দল রোম থেকে তেড়ে এখান পর্যন্ত এসেছে। পর পর তিনবার ওর প্রাণের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। গুলি করেও ধরতে পারেনি ওরা ওকে। শেষ মুহূর্তে, যখন ধরা পড়ে পড়ে, তখন কোনমতে পৌঁছেছিল ও এ বাড়িতে।'

'কারা ওর পেছনে লেগেছিল সে ব্যাপারে কিছু জানতে পারেননি?'

'না। জিজ্ঞেসও করেনি। কারণ আমি জানি, এসব কথা না জানাই ভাল। নির্যাতনের মুখে কোন কথাই শেষ পর্যন্ত গোপন রাখা যায় না। আগে হোক পরে হোক, সত্যি কথাটা বেরোবেই।'

ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যাই হোক, রোববার সারাদিন ছিল ও এখানে, তারপর কি হলো?'

'সন্ধের পর নিয়ে গেল জুলি ওকে মনডোলোর একটা নির্জন পরিত্যক্ত বাড়িতে। অনিলের ইচ্ছে ছিল, কিছুটা সুস্থ বোধ করলেই ভারতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

‘ভারতে?’ অবাক হলো রানা। ‘ভারতে ফিরে যেতে চেয়েছিল ও?’

‘হ্যাঁ। ও বলেছিল যত শীঘ্রি সম্ভব দেশে ফিরে যাওয়া দরকার ওর।’

তাই যদি হবে তাহলে ওকে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী হিসেবে চিত্রায়িত করবে কেন রঞ্জন চৌধুরী? কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকছে ব্যাপারটা রানার কাছে। অবশ্য মিথ্যে কথাও বলে থাকতে পারে অনিল। সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার কোন উপায় নেই এখন। যাচাই ঠিকই করে নেবে রানা–সময় আসুক।

‘তারপর কি হলো? কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল?’

‘না, সিনর। বরং খারাপের দিকেই যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। অনিল যে গুলি খেয়েছে সেটা জানা ছিল ওদের, ডাক্তার ডাকতে গেলেই ধরে ফেলবে, তাই ডাক্তারের সাহায্য নেয়া সম্ভব হয়নি। গুলিটা রয়ে গিয়েছিল শরীরের মধ্যে, পুঁজ হতে আরম্ভ করল ক্ষতস্থানে। গায়ে জ্বর। আমি দর্শন শাস্ত্রের লোক, যতটা পারি ডাক্তারী বই ঘেঁটে গ্যাংগ্রিন ঠেকাবার ওষুধ বাতলে দিই জুলিকে, ও গিয়ে যেমন ভাবে পারে প্রয়োগ করে সে ওষুধ অনিলের ওপর। কিন্তু কদিন পর সেটাও প্রায় বন্ধ হয়ে এল। তিনদিন পর সাদা হ্যাট পরা লোকটা গিয়ে হাজির হলো পাসেল্লীর দোকানে। আমার বর্ণনার সাথে মিলিয়ে চিনতে পারল জুলি ওকে। জুলির সাথে যে অনিলের আলাপ ছিল সেটা জানা ছিল পাসেল্লীর। ওরা বুঝে নিল এ বাড়ির কাছাকাছি এসে অনিলের হারিয়ে যাওয়ার রহস্য। আমাদের বাড়ির চারপাশে পাহারার ব্যবস্থা করা হলো, জুলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, লোক লেগে গেল ওর পছনে। বহু কষ্টে ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে যেতে হত জুলিকে অনিলের কাছে। কখনও দুদিন কখনও বা চারদিন সম্ভব হত না যাওয়া। এমনি সময় ভিয়েনায় ইন্টারপোলের একটা কনফারেন্সের কথা কাগজে

দেখে আশার আলো জ্বলে উঠল অনিলের মনে। জুলিকে বলল, বাংলাদেশের এক দুর্ধর্ষ যুবক আসবে এই করফারেন্সে। ওর নাম মাসুদ রানা। শুনেছে সে, বিপদে পড়ে সাহায্য চাইলে শুধু হাতে ফিরিয়ে দেয়নি সে আজ পর্যন্ত কাউকে। যেমন সৎ, সাহসী, দেশপ্রেমিক, তেমনি বিরাট মহৎ হৃদয় আছে ছেলেটার মধ্যে। যদি কারও সাধ্য থাকে ওকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার...'

খুক খুক করে কাশল রানা। আসলে লজ্জা পেয়েছে ও। চট করে জিজ্ঞেস করল, 'মামা বাড়ির ঠিকানায় একটা পোস্ট কার্ড ছেড়ে দিল, এই তো?'

'হ্যাঁ। তোমার হাতে পৌঁছেছিল সেটা তাহলে ? সরাসরি মায়ের ঠিকানায় পাঠাতে সাহস পায়নি অনিল, পাছে ওটা পোস্ট করতে গিয়ে জুলি ধরা পড়ে যায় ওড্ডি বা গীয়ানের হাতে। যাই হোক এরপর তোমার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না জুলির। যতই দিন যাচ্ছে ততই পাগলা কুকুর হয়ে উঠছে ওরা। এদিকে দিন দিন দুর্বল হতে হতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে কারও সাহায্য ছাড়া নড়াচড়া করাও মুশকিল হয়ে পড়েছে অনিলের পক্ষে। হঠাৎ একরাতে গীয়ান এসে ঢুকল এ বাড়িতে। জুলি তখনও ফেরেনি। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজল লোকটা, কিছু না পেয়ে চলে গেল। একটি কথাও বলার প্রয়োজন মনে করল না আমার সঙ্গে। একা ছিলাম, পঙ্গু, কিছুই করতে পারলাম না। কিন্তু বুঝলাম, অবস্থা চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। জুলিকে বললাম সব, সাবধান করলাম, কিন্তু লাভ হলো না। গতকাল সকালে কাজে চলে গেল মেয়েটা, আজ ভোর রাতে পুলিস এসে জানাল মারা গেছে।'

'আপনার কথা শুনে যতদূর মনে হচ্ছে, পালাতে পারেনি অনিল। ধরা পড়েছে ওদের হাতে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

‘কেন ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল ওরা সে সম্পর্কে কোন রকম ধারণাই হয়নি আপনার?’

‘না, সিনর। কারণটা আমি জানি না।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ, সিনর।’ উঠে দাঁড়াল রানা। ‘এবার চলি আমি।’

রানার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল বাতিস্তা পাহাড়ের মত দরজা আড়াল করে।

‘বাবার সাহায্য নিয়েই উঠে পড়ছেন যে? আমার কি করতে হবে বলে যান।’

পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা ছেলেটাকে। বয়স কম, উনিশ কি বিশ, কিন্তু ওর পেশীর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত শক্তি চিনতে ভুল করল না রানার অভিজ্ঞ চোখ। ঘাড় ফিরিয়ে বৃদ্ধের দিকে চাইল সে। কুরিযো মাযিনির ঠোঁটে অদ্ভুত একটুকরো হাসি।

‘ওকে আনডার-এস্টিমেট করো না, সিনর মাসুদ রানা। জুলির হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্মগত অধিকার আছে ওর। দয়া করে বঞ্চিত করো না ওকে।’

বাতিস্তার দিকে ফিরল রানা। ‘সবচেয়ে ভাল পার কোন্ কাজ তুমি, বাতিস্তা?’

‘মারামারি,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল বাতিস্তা।

মৃদু হাসল রানা। ‘ভাল। তোমাকে যদি বলি কোন লোক বা বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে...’

‘একশোবার পারব। কোন্ লোক?’

‘২২/এ ক্যাম্পো ডি সালিযোতে ওড্ডি আর গীয়ানকে ঢুকতে দেখেছি আমি কিছুক্ষণ আগে। জানি না, হয়তো ওরা ওই বাড়িতেই থাকে, কিংবা ঢুকেছে অন্য কাজে। যাই হোক, আগামী তিনটে ঘণ্টা নজর রাখতে হবে বাড়িটার ওপর। বিশেষ অসুবিধে

হবে বলে মনে হয় না, ওটার ঠিক সামনেই একটা কাফে দেখেছি। সেখান থেকে নজর রাখা যাবে অনায়াসে। আমি জানতে চাই এই তিন ঘণ্টায় কে ওই বাড়িতে ঢুকছে কিংবা ওখান থেকে বেরোচ্ছে। পারবে রিপোর্ট তৈরি করতে?'

'পারব না কেন? কঠিন কিছুই দেখছি না এর মধ্যে।'

'কঠিন ব্যাপারও আছে। সেটা হচ্ছে আত্মসংবরণ করা। ওড্ডি বা গীয়ানকে দেখলেই তাদের পিছু ধাওয়া করবার ইচ্ছেটা দমন করতে হবে তোমাকে কঠোর ভাবে। পারবে সেটা?'

'পারব।'

'গুড। ছদ্মবেশ নেয়ার দরকার আছে তোমার?'

'কি দরকার? আমাকে চেনে না ওরা কেউ। গতকাল সন্ধ্যায় ফিরেছি আমি এক্সকারশন থেকে।'

'ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আপাতত ছদ্মবেশের কোন দরকার নেই। কিন্তু খেয়াল রেখো, কোন রকম আবেগ-প্রবণতা বা কৌতূহলের আতিশয্যকে প্রশ্রয় দিলেই ভণ্ডুল হয়ে যাবে সব। ভুলেও কাউকে অনুসরণ করবে না তুমি, ভুলেও ঢুকবে না ওই বাড়ির ভিতর। কারও গায়ে হাত তুলবে না। রাজি?'

'রাজি।'

'বেশ। ঠিক তিনঘণ্টা পর আমার সঙ্গে দেখা করবে সারাগাত হোটেলের ক্যাসিনোতে। অলরাইট?'

'অলরাইট। কিন্তু এতসব কন্ডিশন দিয়ে আমার হাত-পা বেঁধে একেবারে অথর্ব করে দিচ্ছেন আপনি।'

'ঠিক সময় মত তোমার হাত-পা খুলে দেব আমি, দেখব তখন কত জোরে চালাতে পারো ওগুলো। কিন্তু সে সময়টা নির্ধারণ করবার অধিকার আমাকে দিতে হবে। আমি সিদ্ধান্ত নেব কখন আমরা আক্রমণ করব, কখন পালাব। এর অন্যথা হলে বিপদে পড়ব দুজনই।'

'জানি। এই কাজে নানা মুণির নানা মত চলে না। একজনের নেতৃত্ব মানতে হয়। আপনাকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনার সব কথা মানতে আমি রাজি।'

'ভেরি গুড বয়। তুমিই তাহলে আগে বেরোও। আশেপাশে যদি সন্দেহজনক কাউকে দেখো ফিরে আসবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তুমি ফিরে না এলে আমি বেরোব নিশ্চিন্ত হয়ে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বাতিস্তা।

পাঁচ মিনিট ধরে বৃদ্ধের সঙ্গে কি কথা হলো রানার জানতে পারল না সে।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল রানা।

পঙ্গু বৃদ্ধের কঠোর দুচোখ থেকে ঝরছে তখন আশীর্বাদ।

দশ

ঠিক দশটার সময় ক্যাশ কাউন্টার থেকে প্লেকগুলো ভাঙিয়ে নিল রানা। কোটের দুই পকেটে ভরল পাঁচ হাজার লিরার নোটগুলো। ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে আর সবাই যারা বাজি ধরেছিল। তাক লাগিয়ে দিয়েছে ওদের রানার আশ্চর্য কপাল। ওদের ঈর্ষার কারণ রানার অস্বাভাবিক জয়, অথবা ওদের নিজেদের পরাজয় নয়। হারজিত আছে খেলাতে। খেলোয়াড় ও দর্শকদের মধ্যে এমন খুঁজলে হয়তো এক আধ জন পাওয়া যাবে যারা এর চেয়ে বেশি টাকা জিতেছে জীবনে কোন না কোন সময়। ঈর্ষার আসল কারণ রানার ঠিক সময় মত খেলা বন্ধ করা। জেতা টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে বা যেতে পারছে এটা কল্পনাও করতে পারে না ওরা। নেশায় পেয়ে যায় ওদের। বোর্ড থেকে তোলা টাকা বোর্ডেই রেখে যেতে হয় ওদের, বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় না। হারতে হারতে জেদ চেপে যায়, হারিয়ে যায়

কাণ্ডজ্ঞান। তেমনি হয় জিততে জিততে। আশ্চর্য লোকটার সংযম! উঠে যাচ্ছে!

সবার জন্যে এক পেগ করে ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল রানা। টেবিলে এসে দাঁড়াল আর সবার খেলা দেখবার জন্যে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরপরই চোখটা চট করে ঘুরে আসছে লাউঞ্জের ওপাশের দরজার ওপর থেকে। ঘড়ি দেখল। দশটা পাঁচ। দেরি করছে কেন বাতিস্তা?

পাঁচজন বেয়ারা দ্রুত সার্ভ করছে সবার ব্র্যান্ডির গ্লাস। রানার এই অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে খুশি হলো সবাই। জিতে নিয়ে যাওয়ার বেয়াদবি মাফ করে দিল বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই। একজন বলেই বসল, আমার এই দশ হাজারী প্লেক দুটো আপনি নিজের হাতে একটু চেলে দেবেন, সিনর গামাল? হারলে আপনার কোন দোষ নেই, জিতলে অর্ধেক আপনার।'

হাসল রানা।

'অর্ধেক লাগবে না। রাখুন না, লালে রাখুন। আপনি নিজেই রাখুন।'

'না। আপনার হাতে।' প্রায় জোর করে গুঁজে দিল লোকটা প্লেক দুটো রানার হাতে।

হাতে কাঠি তুলে নিল আবার ক্রুপিয়ে ব্র্যান্ডির গ্লাসটা একজন বেয়ারার হাতে ধরিয়ে দিয়ে। ছোট্ট একটা নড করল রানার দিকে চেয়ে। প্লেক দুটো লাল ঘরে রেখে দিল রানা। ব্যস হিড়িক পড়ে গেল সবার মধ্যে লালে রাখার। হুড়মুড় করে যে যত পারল রাখল লালে। কালো ঘরে শুধু একটা লিরার প্লেক।

ঘুরল রুলেতের চাকা। ছোট্ট আইভরি বলটা ছুটে বেড়াতে লাগল থালার মধ্যে। উৎসুক চোখে চেয়ে রয়েছে সবাই ক্রমে থেমে আসা থালাটার দিকে। রানা চাইল লাউঞ্জের ওপাশের দরজার দিকে। আসছে না কেন এখনও? কোন বিপদে পড়ল?

নাকি গীয়ান বা ওড্ডিকে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে অনুসরণ করেছে? মাথা ঠিক রাখতে না পেরে ঢুকে পড়েনি তো বাড়িটার ভিতর?

কমে এসেছে চাকার গতি। সাদা বলটা ডাব্‌ল্ জিরো, অর্থাৎ সবুজ দুটো ঘরের একটায় জমে বসতে গিয়েও কেমন একটা পাক খেয়ে সরে গেল আবার। সব কজন দর্শকের পিলে চমকে উঠেছিল ওটার সবুজ প্রীতি দেখে, ভুশ করে দম ছাড়ল একসঙ্গে। সবুজে পড়লে কেউ পেত না একটি পয়সাও।

লাউঞ্জের ওপাশের দরজা দিয়ে ঢুকল বাতিস্তা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এগোল রানা সেদিকে। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। সবাই যদি দানটা হেরে যায় তাহলে বিশ্রী একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আর যদি জেতে তাহলে টানা-হেঁচড়া পড়ে যাবে ওকে নিয়ে, ছাড়তে চাইবে না কিছুতেই। প্রত্যেকটা চোখের দৃষ্টি আঠার মত লেগে আছে হাতির দাঁতের ছোট্ট সাদা বলটার গায়ে, দম বন্ধ করে লক্ষ করছে ওটার মতিগতি, এই সুযোগে কেটে পড়াই ভাল। ক্যাসিনোর কাঁচের দরজার কাছাকাছি এসে শুনতে পেল রানা ক্রুপিয়ের পরিষ্কার কণ্ঠস্বর:

'টোয়েনটি এইট–রেড–হাই অ্যান্ড ইভেন।'

'হো' করে এত প্রচণ্ড এক সমবেত উল্লাসধ্বনি উঠল যে রানার মনে হলো ক্যাসিনোর ছাতটা সাঁ করে উড়ে গিয়ে ঢাকায় পড়বে। শব্দের ধাক্কায় ছিটকে বেরিয়ে গেল সে দরজা দিয়ে। বাতিস্তাকে লিফটে ওঠার ইঙ্গিত করে নিজেও উঠে পড়ল। লিফট এসে থামল ছ'তলায়। লম্বা করিডর ধরে হেঁটে বাঁদিকে সবশেষের ঘরটায় নিয়ে গেল রানা ওকে।

'কি খবর, বাতিস্তা? বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে তোমাকে?' খাটের কিনারে বসে একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসবার ইঙ্গিত

করল রানা ওকে ।

'হ্যাঁ । বেশ গরম খবর আছে!' বসল বাতিস্তা ।

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ । ওই রেস্তোরাঁয় বসেই সেরে নিয়েছি ।'

'বেশ । শুরু করো তাহলে ।' নড়েচড়ে বসল রানা ।

পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করল বাতিস্তা । লিখে নিয়ে এসেছে । চোখ বোলাল নোটের ওপর ।

'ঠিক আটটা সাতে দেখলাম গিয়াকোমো পাসেল্লীকে । হন হন করে হেঁটে এসে টোকা দিল দরজায় । ভেতর থেকে কে যে দরজা খুলে দিল, দেখতে পেলাম না । ও ভেতরে ঢুকে পড়তেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা ।' আবার একবার নোটের দিকে চাইল বাতিস্তা । 'আটটা পঁয়তাল্লিশে তিনজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ঢুকল বাড়িটায় । চেহারা আর চালচলনে বোঝা গেল ভয়ঙ্কর লোক এরা, কেউ কারও চেয়ে কম নয় । একজনের চেহারাটা চেনা-চেনা লাগলেও প্রথমে চিনতে পারিনি, এই হোটেলে আসার পথে মনে পড়েছে । মাস তিনেক আগে ওর ছবি বেরিয়েছিল কাগজে । সিসিলির দুর্ধর্ষ গুণ্ডা পপিনি । খুন করে ফেরারি রয়েছে সে, খুঁজছে পুলিস । যাই হোক, ওদের একজনের হাতে একটা সুটকেস ছিল । মনে হলো সদ্য এসে পৌঁছেচে ভেনিসে । দরজায় টোকা দিল, দরজা খুলল সাদা হ্যাট পরা সেই লোকটা, ওরা ঢুকে যেতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা ।'

রানার বাড়িয়ে ধরা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নিষেধ করল বাতিস্তা । খায় না । কাগজের ওপর চোখ বোলাল কয়েক সেকেন্ড, তারপর শুরু করল আবার ।

'এরপর আধঘণ্টা কিছুই ঘটল না । তারপর বেরিয়ে এল গিয়াকোমো পাসেল্লী । মাথা উঁচু করে আত্মগরিমার ভঙ্গিতে ঢুকেছিল লোকটা বাড়িটায়, কিন্তু বেরিয়ে যখন এল তখন সম্পূর্ণ

আলাদা এক মানুষ। যেন বিধ্বস্ত এক অসুস্থ লোক, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, ভাবলেশহীন মুখ, চলার ভঙ্গি শ্লথ, শিথিল। মনে হলো ভয়ঙ্কর কিছু দেখে বেরিয়ে এসেছে ও বাড়িটা থেকে। পরিষ্কারভাবে এত কিছু দেখতে পেয়েছি এই জন্যে যে সবুজ দরজা দিয়ে বেরিয়েই সোজা এই কাফের দিকে এগিয়ে এল পাসেল্লী। আমি চট করে একটা খবরের কাগজে মুখ আড়াল করলাম আমাকে চিনে ফেলবে মনে করে। কিন্তু তা না করলেও চলত। কোনদিকে চেয়ে দেখবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না ওর। সোজা এসে একটা টেবিলে বসে ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল পাসেল্লী। প্রায় ঢক ঢক করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিন পেগ ব্র্যান্ডি খেয়ে দাম দিয়ে কোনদিকে না চেয়ে কারও সঙ্গে একটি কথা না বলে উঠে গেল পাসেল্লী। পকেট থেকে যখন মানিব্যাগটা বের করল, লক্ষ করলাম থরথর করে কাঁপছে ওর হাতটা। দশ মিনিট চুপচাপ—তারপর আরও দুজন লোক ঢুকল বাড়িটায়। দুজনেরই পরনে দামী পোশাক-পরিচ্ছেদ। একজনের বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ মত হবে, ক্লিন-শেভড, দেখতেও দারুণ হ্যান্ডসাম, মাথায় সোনালী চুল, এক নজরেই বোঝা যায় খুবই ধনীলোকের ছেলে, মনে হয় কোনদিন খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ধার কাছ দিয়েও যায়নি।'

রানা বুঝে নিয়েছে এ লোক সিলভিও পিয়েত্রো ছাড়া আর কেউ নয়। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে বালিশে আধশোয়া হয়ে হেলান দিয়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'সঙ্গের লোকটা?'

'এর সঙ্গের লোকটাকে ভেনিসের সবাই চেনে। ডক্টর আমানান্তি। বিরাট ডাক্তার। বড়লোকদের মধ্যে ওর দারুণ পসার।'

তড়াক করে উঠে বসল রানা।

'এই দুজন ঢুকল ওই বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। ডাক্তারের হাতে ব্যাগ দেখে মনে হলো রোগী দেখতে এসেছে। ওই ঢুকল আগে, তারপর ঢুকল ছেলেটা। দেখে মনে হলো আগেও দেখে গেছে ডাক্তার এই রোগীকে এক আধবার। আমার মনে হচ্ছে সিনর চ্যাটার্জীকে ওই বাড়িতেই রাখা হয়েছে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল রানা। 'ডাক্তারের উপস্থিতি দেখে এই সন্দেহটা আসাই স্বাভাবিক। যাক, তারপর কি হলো?'

'দশটা বাজতে দশ মিনিটে বেরিয়ে এল ডাক্তার আমানাত্তি, চলে গেল। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে উঠে পড়লাম আমি। ঠিক সময়েই উঠেছিলাম, কিন্তু রাস্তায় পড়ে গেলাম একদল ট্যুরিস্টের ভিড়ে। ওদের ঠেলে ধাক্কিয়ে পথ করে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল কিছুটা। যাই হোক, এবার আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম কি? আক্রমণ?'

ডান হাতের তালুতে গাল ঘষল রানা। চিন্তা করল মুখচোখ বাঁকিয়ে। তারপর বলল, 'এই মুহূর্তে কমপক্ষে কজন লোক আছে ওই বাড়িতে? তিন, দুই, পাঁচ, আর এক, ছয়। আরও থাকতে পারে। আমরা দুজন পারব না তা নয়, কিন্তু কষ্ট হবে। আর একজন হলে ভাবতাম না। তাছাড়া অনিলকে যদি ওখানে পাওয়া যায় তাহলে ওকে নিরাপদে বের করে আনার জন্যেও লোক দরকার। লোক যখন নেই তখন কিছু একটা কৌশল বের করতে হবে আমাদের। এক কাজ করা যায়–'

হঠাৎ এক লাফে উঠে দাঁড়াল বাতিস্তা। নিজের মনেই বলে উঠল, 'পাগলা ওস্তাদকে বললে কেমন হয়?'

'পাগলা ওস্তাদটা কে?'

'আমাদের ইউনিভারসিটির অ্যাথলেটিক কোচ। খুব সম্ভব সারা ইউরোপের সেরা কোচ ভদ্রলোক। মনে-প্রাণে স্পোর্টসম্যান। খুবই ভাল লোক। ওঁকে বললেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন উনি সাহায্য করতে। খুবই ভালবাসেন আমাকে।'

‘ভদ্রলোককে বিশ্বাস করা যায়? নির্ভরযোগ্য?’

‘হানড্রেড পারসেন্ট।’

‘এই গোলমালের মধ্যে জড়াতে চাইবেন উনি? এসব ভয়ঙ্কর লোকদের বিরুদ্ধে যেতে চাইবেন?’

‘চলুন না, গিয়ে দেখা যাক?’

‘সাহায্য পাই বা না পাই, আজই আক্রমণ করতে হবে আমাদের। কাজেই তোমার চেহারাটা একটু বদলে দিই, এসো। তোমাকে এই শহরেই থাকতে হবে তো, আমি চাই না চিনে ফেলুক ওরা তোমাকে।’

দশ মিনিটের মধ্যে চমৎকার একজোড়া গোঁফ গজিয়ে গেল বাতিস্তার নাকের নিচে। পাল্টে গেল সিঁথি। গালে-কপালে কয়েকটা দাগ পড়তেই বয়স বেড়ে গেল আরও বিশ বছর। বিছানার চাদর দিয়ে ছোটখাট একটা ভুঁড়ি তৈরি হলো জুৎসই গোছের।

টেলিফোন করে ডেস্ক-ক্লার্ককে জানিয়ে দিল রানা, অতিরিক্ত জরুরী কোন দরকার না হলে যেন তাকে বিরক্ত করা না হয়, ঘুমাবে সে। কেউ কোন গোলমাল করলে আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।

দরজায় তালা মেরে ইমার্জেন্সি ফায়ার-এসকেপের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা নিচে। সবার অলক্ষ্যে বাঁ পাশের গলিপথ ধরে এগিয়ে পড়ল এসে রাস্তায়।

প্রচণ্ড শব্দে নাক ডাকছিল স্টেফানো মন্টিনির।

আস্তে করে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। রানা দেখল আধমনী একটা ভুঁড়ি উঠছে নামছে, থরথর করে কাঁপছে ঘরের আসবাব-পত্র। বিপুল বিক্রমে ঘুমাচ্ছে বাতিস্তার ওস্তাদ। প্রকাণ্ড মোটা। লম্বা হবে বড়জোর পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, কিন্তু গোটা দশেক

রানাকে একসঙ্গে কষে বাঁধলেও ওর সমান মোটা হবে কিনা সন্দেহ। এক একটা বাহু রানার ঊরুর মত। মাথা ভর্তি টাক, কানের পাশ দিয়ে ঘাড়ের পেছন দিকে সামান্য চুলের আভাস পাওয়া যায়—পঁচাত্তর ভাগ পাকা। বয়স পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন। কাঁচা পাকা গোঁফ জোড়া ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে নেমে এসেছে নিচের দিকে, মিশেছে থুতনির কাছে গজানো ইঞ্চিখানেক লম্বা দাড়ির সঙ্গে।

পাশ ফিরল ওস্তাদ। ক্যাঁচম্যাঁচ করে মহা আপত্তি জানাল খাটের উৎপীড়িত স্প্রিং। সেদিকে মোটেই লক্ষ না দিয়ে হালকাভাবে শুরু হলো আবার নাসিকা গর্জন। ক্রমে বাড়তে বাড়তে উঠে যাবে চরম পর্যায়ে।

এর কাছে কতটা সাহায্য পাওয়া যাবে বুঝে নিয়েছে রানা, নিঃশব্দে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল সে বাতিস্তাকে। কিন্তু ততক্ষণে ডাক দিয়ে ফেলেছে বাতিস্তা।

'ওস্তাদ।'

তড়াক করে উঠে বসল ওর ওস্তাদ। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ওদের দুজনকে।

'কি চাই?' গম্ভীর গমগমে কণ্ঠস্বরে কেঁপে উঠল ঘরটা।

'সাহায্য চাই, ওস্তাদ,' বলল বাতিস্তা।

'ওস্তাদ!' অবাক হয়ে আবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল বাতিস্তাকে। 'আমি তোমার ওস্তাদ না। এত সুন্দর একটা শরীরে যে ওই...ওই'...আঙুল দিয়ে বাতিস্তার ভুঁড়িতে খোঁচা দেয়ার ভঙ্গি করল স্টেফানো মন্টিনি, 'ওই রকম একটা ভুঁড়ি গজাতে দেয়, আমি তার ওস্তাদ নই। কেউ হও না তুমি আমার। কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?' কটমট করে চাইল ওস্তাদ বাতিস্তার দিকে।

রানা দেখল এই গতিতে এগোলে পরিচয়পর্ব শেষ হতেই মেলা সময় লেগে যাবে। চট করে বলল, 'বাতিস্তার বোনকে যারা

খুন করেছে তারা আমার এক বন্ধুকে আটকে রেখেছে একটা বাড়িতে...'

আঁৎকে উঠল স্টেফানো মন্টিনি। 'কি বললে! আমাদের বাতিস্তার বোনকে খুন করেছে? কোন্ শুয়োরের বাচ্চা?' এক লাফে নেমে পড়ল খাট থেকে। 'দাঁড়াও, আমি কাপড়টা পরে নিচ্ছি এক্ষুণি।'

বিনা দ্বিধায় ন্যাংটো হয়ে গেল পাগলা ওস্তাদ রানা ও বাতিস্তার সামনে। আলনা থেকে এমন একটা টাইট-ফিটিং জাঙ্গিয়া টেনে নিয়ে পরল যেটার পায়ের ফাঁক গলে ঢুকে যাবে আস্ত রানা। একটা হাফ প্যান্ট আর একখানা স্পোর্টস জ্যাকেট চড়িয়ে ফিরল রানার দিকে।

'তোমরা কে? মেরে ফেলেছে তারপর এসেছ খবর দিতে। মারার আগে আসতে পারোনি? বাতিস্তা কোথায়?'

'আমিই বাতিস্তা, ওস্তাদ। ইনি সিনর মাসুদ রানা, বাংলাদেশের লোক। আমরা দুজনেই ছদ্মবেশে আছি।' ওস্তাদের চোখ কপালে উঠতে দেখে চট করে যোগ করল বাতিস্তা, 'সব ভেঙেচুরে বলবার সময় নেই, ওস্তাদ, হাতে একেবারেই সময় নেই। দেরি হলে হয়তো ওদের আর পাব না। এখুনি আক্রমণ করতে হবে আমাদের। আপনি যাবেন কিনা বলুন।'

'যাব মানে? একশোবার যাব। কিন্তু... তুমিই ঠিক বাতিস্তা তো? আর ইউ শিওর? আমি কিন্তু একেবারেই চিনতে পারছি না।' বাতিস্তার কাপড়ের ভুঁড়িটা একটু টিপে দেখল ওস্তাদ।

'আমাদের দুজনের তুলনায় লোক একটু বেশি বলেই এত রাতে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।' বলল রানা বিনীত ভাবে। 'পথে চলতে চলতে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে আপনাকে জানাব আমরা ব্যাপারটা। রওয়ানা হওয়ার আগে আপনার একটা কথা জেনে রাখার দরকার, ওস্তাদ—কাজটা কিন্তু বিপজ্জনক। ওরা সশস্ত্রও

হতে পারে। আশা করছি ওই বাড়িতে জনাছয়েক লোক আছে, কিন্তু আসলে এর দ্বিগুণ লোকও থাকতে পারে। আমাদের কারও পক্ষেই প্রাণ নিয়ে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নাও হতে পারে। আপনি ইচ্ছে করলেই না করে দিতে পারেন, কিছুই মনে করব না...'

কটমট করে চাইল ওস্তাদ রানার দিকে। 'বড় বেশি কথা বলো হে তুমি, ছোকরা। কোন্ ইয়ারে পাস করেছ? ভুলেই গেছ আমাকে? চলো, আগে বাড়ো। দেখা যাবে আজ আমার ট্রেনিং কে কতটা মনে রেখেছ।' বাতিস্তাকে ঘর থেকে বেরোবার ইঙ্গিত করে বলল, 'আর বাতিস্তা, অবশ্য তুমি যদি সত্যিই বাতিস্তা হও, তোমার বোনের মৃত্যু সংবাদে আমি সত্যিই দুঃখিত। তোমার বোনই তো তোমার পড়ার খরচ চালাত, তাই না? আ-হা-হা। আমার যদি অনেক টাকা থাকত...'

'আপনার চেহারাটা একটু পাল্টে নিলে হত না, ওস্তাদ? আমি তো কাজ সেরে চলে যাব বাংলাদেশে, আপনাকে থাকতে হবে ভেনিসেই।'

'তিন হাজার অ্যাথলেট এসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আমি একটা ডাক দিলে।' হাসল ওস্তাদ। 'ভয় নেই, আমার কোন ক্ষতি করবার আগে তিন হাজার বার চিন্তা করবে যে-কোন লোক। চলো।'

শুনে তাজ্জব হয়ে গেল পাগলা ওস্তাদ।

'কি এমন জিনিস রয়েছে তোমার বন্ধুর কাছে যার জন্যে এতসব কাণ্ড করতে, এমনকি জুলির মত একটা নিরপরাধ মেয়েকে হত্যা করতেও বাধল না ওদের?'

গনডোলা ছেড়ে দিল বাতিস্তা।

'আমি জানি না, ওস্তাদ,' বলল রানা। 'সেইটাই জানতে হবে

আমাকে।’

‘তোমার বন্ধু কি কোন বে-আইনী কাজে লিপ্ত?’

‘তা-ও জানি না, ওস্তাদ। কিন্তু এটুকু জানি, যা-ই করে থাকুক অনিল চ্যাটার্জী, বিচার পাওয়ার অধিকার ওর আছে। এভাবে কুকুরের মত তাড়া খেয়ে মরতে দিতে পারি না আমরা ওকে বিদেশ-বিভূঁইয়ে।’

‘তা ঠিক। এবার কি প্ল্যান করছ বলো। বাড়িটার পেছন দিক থেকে ঢুকতে চাও?’

‘আগে দেখে নিই পেছনটা, তারপর কিভাবে কি করা যায় স্থির করা যাবে।’

লম্বা কালো গনডোলা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল অন্ধকার ভেদ করে। সরু খাল, বাড়িটার পেছন ঘেঁষে চলে গেছে পশ্চিমে। প্রকাণ্ড একখানা চাঁদ আলো করে রেখেছে আকাশটাকে, কিন্তু লম্বা বাড়িগুলোর গায়ে আটকে যাওয়ায় খালে এসে পড়তে পারছে না ওটার আলো। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার বাড়িগুলো, ছাদের কার্নিসে কার্নিসে ভৌতিক আলোর খেলা। খুক করে গলা পরিষ্কার করল বাতিস্তা।

‘লণ্ঠনটা কমিয়ে দিন, সিনর। এসে গেছি।’

প্রায় নিভিয়ে দিল রানা মৃদু আলোটা। আধ মিনিটের মধ্যেই একটা দোতলা বাড়ির পেছনে থেমে দাঁড়াল গনডোলা। বৈঠা রেখে এগিয়ে এল বাতিস্তা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা বাড়ির পেছন দিকটা। আলোর আভাস মাত্র নেই। পনেরো ফুট ওপরে একটা ব্যালকনি দেখা যাচ্ছে, তার ফুট দশেক ওপরে মোটা গরাদ দেয়া ছোট একটা জানালা। ব্যালকনিতে আসার জন্যে নিশ্চয়ই দরজা আছে একটা, পাশে একখানা জানালা থাকাও বিচিত্র নয়, কিন্তু অনেকক্ষণ ঠাহর করে বোঝা গেল না পরিষ্কার। ওই ব্যালকনি

ছাড়া আর কোন জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকবার উপায় দেখতে পেল না রানা।

'একটা হুক আর কিছু দড়ি পেলে এই ব্যালকনি দিয়ে ঢোকা যায় ভেতরে।' পকেট থেকে টর্চটা বের করল রানা, 'জানালা-দরজা আছে কিনা দেখে নেয়া যাক।'

টর্চের মুখটা অ্যাডজাস্ট করে সূক্ষ্ম একটা রশ্মিতে পরিণত করল রানা আলোটাকে। একটা বন্ধ দরজার ওপরের অংশ দেখা গেল কিছুটা। একটা জানালারও সামান্য কিছুটা অংশ দেখা গেল, কিন্তু তাতে গরাদ আছে কিনা বোঝা গেল না।

'রশি হুক আছে আমার কাছে, সিনর। উঠে যাব ওপরে?'

'দাঁড়াও, এখন না। ওস্তাদ, গনডোলা চালাতে পারেন?'

'পারি মানে? বাতিস্তাকে ইন্টার-ইউনিভারসিটি গনডোলা চ্যাম্পিয়ান বানাল কে?'

'ভেরি গুড। চলো বাতিস্তা ওস্তাদকে বাড়ির সামনেটা একটু দেখিয়ে আনা যাক।'

নিঃশব্দে ঘুরল গনডোলা, কিছুদূর গিয়ে ঘ্যাস্‌স্‌ করে থামল একটা গলিমুখের কাছাকাছি। দু'তিনটে মোড় ঘুরে ক্যাম্পো ডেল সালিযোতে পড়ল ওরা। দূর থেকে আঙুল তুলে দেখাল রানা।

'ওই যে সবুজ পেইন্ট করা দরজা দেখা যাচ্ছে, ওই বাড়িটা।'

কথাটা বলতে না বলতেই খুলে গেল দরজাটা। বেরিয়ে এল সিলভিও পিয়েত্রো। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল সিলভিও, এদিক ওদিক চাইল, তারপর সোজা হাঁটতে শুরু করল রানার দিকে। চট করে গলির ভিতর ঢুকে অন্ধকার থামের আড়ালে আত্মগোপন করল ওরা। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। কিছুদূর সোজা হেঁটে এসে ডান দিকের একটা গলিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সিলভিও।

'অনিল ছাড়া এখন রইল আর পাঁচজন। কমপক্ষে

পাঁচজন—আসলে আরও বেশি হতে পারে। কাজেই ওদের তাক লাগিয়ে না দিতে পারলে কাবু করা মুশকিল হবে। অনিল যদি এই বাড়িতে থাকে, তাহলে ওকে বের করে আনাও এক মহা সমস্যা হবে। ওকে এখান থেকে সরাতে হলে যদি স্ট্রেচারের দরকার হয় তাহলে তো বিকট ঝামেলা।' অনেকটা আপন মনে বলছিল রানা কথাগুলো, হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরল বাতিস্তার দিকে। 'তুমি ওস্তাদকে নিয়ে বাড়িটার পেছন দিকে চলে যাও। ব্যালকনি দিয়ে ঢুকে পড়ো বাড়ির ভেতর। এখন থেকে ঠিক দশ মিনিট পর সামনে দিয়ে ঢুকব আমি।'

'একা?'

'হ্যাঁ। সামনে পেছনে দুই দিক থেকে চমকে দিতে হবে ওদের। আমি না ঢোকা পর্যন্ত চুপচাপ থাকবে, কোন গোলমাল করবে না। আর একটা কথা, আমাদের প্রথম কাজ অনিলকে উদ্ধার করা, প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ আসবে পরে। কাজেই ওডিড বা গীয়ানকে যদি পাইও, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এক সেকেন্ড বেশি সময় ব্যয় করব না আমরা। রাজি?'

'রাজি। কিন্তু, সিনর, জানালায় যদি লোহার বার থাকে, আর দরজা যদি ভেতর থেকে আটকানো থাকে তাহলে? আপনি একা ওই বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়লে কি উপায় হবে?'

'পেছন দিয়ে যদি ঢুকতে না পারো তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারো সামনে চলে আসবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'আর আমি?' এতক্ষণে কথা বলল পাগলা ওস্তাদ। 'আমার কি করতে হবে?'

'বাতিস্তা যদি ওই ব্যালকনি দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারে তাহলে আপনি গনডোলা নিয়ে ফিরে আসবেন এখন ওটা যেখানে আছে সেইখানে। তারপর সামনে দিয়ে ঢুকবেন বাড়িটায়। যদি

ওদের কাবু করতে পারি তাহলে সামনের দরজা দিয়ে বেরোতে হবে আমাদের অনিলকে নিয়ে। যান, রওনা হয়ে যান, ওস্তাদ।'

রানার কাঁধের ওপর একখানা আড়াইমনী হাত রাখল পাগলা ওস্তাদ। 'কাজটা তোমার জন্যে একটু বেশি বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে না? প্রথমে আমি সামনে দিয়ে ঢুকলে কেমন হয়?'

'দেখুন ওস্তাদ, আপনাকে আগেই বলেছি, এই খেলায় আমি ক্যাপ্টেন, আমার আদেশ মানতে হবে। ভুলই হোক আর ঠিকই হোক, আমি যা বলি তাই করতে হবে খাঁটি স্পোর্টসম্যানের মত। আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না। দুই মত দুই পথ হয়ে গেলে অনর্থক তর্কাতর্কি করে সময় নষ্ট হবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'পেরেছি বাবা, পেরেছি। আজকালকার ছেলে তো নয়, একেবারে পেরেক। আমার প্রস্তাব তুলে নিচ্ছি আমি।'

'তবু ভাল, কাজে নেমে তারপর প্রশ্ন তোলেননি, কাজ শুরুর আগেই উঠেছে কথাটা। ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ আছে আমার। আমাদের তিনজনের মধ্যে দুজন গনডোলা চালাতে জানে, একজন জানে না। একজনকে ওদের চিনে ফেলবার সম্ভাবনা আছে, দুজনকে চিনবে না। আমাদের কাজ হচ্ছে ওদের অবাক করে দিয়ে পরাস্ত করা, এবং অনিলকে গনডোলায় তুলে নিয়ে পলায়ন। তার জন্যে ওটাকে বাড়ির পেছন থেকে বেয়ে এ গলির মুখে নিয়ে আসা দরকার।' হাসল রানা। 'এবার রওনা হয়ে যান, ওস্তাদ, চিন্তা করে বের করুন দেখি আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার মধ্যে কোন খুঁত পাওয়া যায় কিনা।'

ওদের বিদায় করে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা।

অপেক্ষা করতে ভাল লাগে না ওর। অপেক্ষার সময় যেন কাটতেই চায় না। নানান চিন্তা আসতে শুরু করল ওর মাথায়। পেছন দিয়ে ঢুকতে পারবে তো বাতিস্তা। যদি না পারে তাহলে সামনের দিকে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে? ততক্ষণ পারবে

সে টিকে থাকতে? কজন লোক আছে এ বাড়ির ভিতর? অনিলকে পাওয়া যাবে তো এখানে? পাওয়া গেলে আপাতত খোঁজার শেষ। কিন্তু যদি না পাওয়া যায়? শেষ না দেখে পুলিসের সাহায্য নেবে না, স্থির করেছে সে। পুলিসের সাহায্য চাইলেই যে কতটা পাওয়া যাবে সে ব্যাপারেও সন্দেহ আছে ওর। কার কাছে খবর পেল পুলিস যে সেই ভাঙা বাড়িটায় জুলির লাশ পাওয়া যাবে?

রঞ্জন চৌধুরীর ব্যবহারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকেছে রানার কাছে। এমন ভাব দেখাল যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অনিল, ঢাকায় মেজর জেনারেলকে অনুরোধ করেছে, রানা যেন এ ব্যাপারে নাক না গলায় রানার ওপর সেরকম আদেশ জারি করতে। চারদিকে ঢাক ঢাক গুড় গুড়। অথচ অনিল সেই ভারতেই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে কেন? অনুতপ্ত? উঁহুঁ, মেলে না।

শেষ বারের মত ঘড়ি দেখল রানা। দেয়ালের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে এল সে। দৃঢ়, লম্বা পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল সবুজ দরজাটার সামনে। সিঁড়ি বেয়ে তিন ধাপ উঠে জোরে তিনটে টোকা দিল দরজার গায়ে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিন্তু আবার টোকা দেয়ার জন্যে রানা যেই হাত তুলল, ওমনি ঘটাং করে খুলে গেল দরজার বল্টু। দু'ফাঁক হয়ে গেল দরজা। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে বেঁটে মোটা গীয়ান। ভুরু কুঁচকে চাইল রানার মুখের দিকে। মুহূর্তে চিনতে পেরেছে সে মিশরীয় ট্যুরিস্টকে।

'কি চাই এখানে?' কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল গীয়ান।

'ডক্টর আমানান্তির একটা জরুরী কল আছে।' কথাটা বলতে বলতে গীয়ানকে প্রায় ঠেলে ঢুকে এল রানা বাড়ির ভিতর। 'উনি এখানে আছেন শুনে এসেছি।'

‘নেই। ছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে...’

কথাটা আর শেষ করতে পারল না গীয়ান, হুঁক করে একটা চাপা আওয়াজ বেরোল ওর মুখ দিয়ে, বাঁকা হয়ে গেল ভুঁড়ির ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে। পরমুহূর্তে চোয়ালের ওপর পড়ল রানার বজ্রমুষ্টির লেফট্‌হুক।

পা ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল ওকে রানা। কানের কাছে মুখ নিয়ে মধুর কণ্ঠে বলল, ‘তোমার নিজের দাওয়াই দিলাম একটু। কেমন বুঝছ, মটু মিঞা?’

ঘাড়ের ওপর একটা মাঝারি ওজনের রদ্দা মেরে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে শুইয়ে দিল রানা ওকে মেঝের ওপর। ওর শরীর ডিঙিয়ে এসে বন্ধ করে দিল সামনের দরজাটা। যাক, বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে সে। দ্রুত চোখ বোলাল চারপাশে বাড়ির নকশাটা মোটামুটি বুঝে নেয়ার জন্যে।

সামনেই সিঁড়ি। ডানদিকে বেশ লম্বা একটা করিডর। করিডরের দুপাশে দুটো এবং শেষ মাথায় একটা বন্ধ দরজা দেখা যাচ্ছে। কম পাওয়ারের বাতি দিয়ে ম্লানভাবে আলোকিত প্যাসেজটা।

কান খাড়া করল রানা। শেষ মাথার ঘর থেকে কয়েকজনের কথাবার্তার আওয়াজ আসছে, তাছাড়া সব চুপচাপ।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠাই স্থির করল রানা। কিন্তু রওনা হতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। দোতলার কোন একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। ঝট করে সরে এল রানা সিঁড়ির নিচে, ছায়ায়।

ধুপধাপ পায়ের শব্দ এসে থামল সিঁড়ির কাছে।

‘গীয়ান? কে এল?’

রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে ওড্ডির মুখের একাংশ দেখতে পেল রানা। কুঁচকে আছে ভ্রূ।

সিঁড়ির নিচে অপেক্ষা করছে রানা। প্রস্তুত।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ওড্ডি। অর্ধেক নেমেই দেখতে পেল সে গীয়ানের জ্ঞানহীন দেহটা। থমকে দাঁড়িয়ে ভাল করে লক্ষ করে দেখল সে।

নিচু গলায় কি একটা গালি দিল ওড্ডি, তারপর দুড়দাড় করে নেমে এল বাকি ধাপ কটা। নিচু হয়ে ঝুঁকে গীয়ানকে দেখল সে, কিন্তু সে শুধু এক সেকেন্ডের জন্যে, সিঁড়ির নিচে রানা সামান্য একটু নড়ে উঠতেই ঝট করে ফিরল এদিকে।

আধ সেকেন্ড পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইল ওরা। তারপর লাফ দিল রানা।

রানা আশা করেছিল বাঁ দিকে সরবে ওড্ডি, কিন্তু সরল ডানদিকে। একহাতে গলা টিপে ধরল রানা ওড্ডির, অন্য হাতে ঘুসি চালাল থুতনির নিচে। কিন্তু কোনটাই তেমন কার্যকরী হলো না লক্ষ্য সামান্য একটু ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ায়।

হাড্ডির মত শক্ত ওড্ডির হাত। এক হাতে ঠেকিয়ে দিল রানার ঘুসি, সামান্য একটু কাত হয়ে দড়াম করে মারল রানার পাঁজরার ওপর প্রচণ্ড একটা হুক। এক পা পিছিয়ে গেল রানা, গলা থেকে হাত ছুটে গেলেও চট করে ধরে ফেলল ওর কোটের কলার, হ্যাঁচকা টান দিল।

শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ওড্ডি। সাঁই করে লাথি মারল রানা ওর পায়ের কব্জিতে। হুড়মুড় করে পড়ল ওড্ডি মাটিতে, পড়েই বাঁ পা-টা রানার বুকে বাধিয়ে জোরে ধাক্কা দিল।

'ইউজিনো! রিক্কি! পপিনি!' তারস্বরে ডাক ছাড়ল সে রানাকে আবার বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে। উঠে বসতে যাচ্ছিল, শুয়ে পড়ল আবার প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে।

দুপাট খুলে গেল করিডরের শেষ মাথার দরজাটা। ইয়া লম্বা চওড়া এক লোক বেরিয়ে এল সরু প্যাসেজে। তার পেছনে তার চেয়েও প্রকাণ্ড আরও দুজন লোক। সামনের লোকটাকে এক

হাতে সরিয়ে দিয়ে নিজে আগে আসার চেষ্টা করছে পিছনের লোকটা। দ্রুত এগোচ্ছে ওরা।

কে কার আগে আসবে তাই নিয়ে সরু প্যাসেজে একে অন্যের বাধা সৃষ্টি করছে ওরা, এই সুযোগে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা ওড্ডিকে ছেড়ে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে। পাগলের মত সামনের দিকে ঝুঁকে এল ওড্ডি। রানার বাঁ পা-টা দ্বিতীয় ধাপ ছেড়ে চতুর্থ ধাপে উঠতে যাবে, এমন সময় দুই হাতে খপ করে চেপে ধরল সে পায়ের কব্জি, মারল টান। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা সিঁড়ির ওপর উপুড় হয়ে।

জোরে ঠুকে গেল কপাল, অন্ধকার হয়ে আসতে চাইল ওর চোখ। কিন্তু মন শক্ত করল রানা। এই অবস্থায় জ্ঞান হারানো মানে অবধারিত মৃত্যু। প্রাণপণ শক্তিতে অন্ধের মত পা ছুঁড়ল পেছন দিকে। ওড্ডির কাঁধের ওপর পড়ল লাথিটা! পা ছেড়ে দিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে প্রথম লোকটার পায়ের ওপর।

একলাফে ওড্ডিকে টপকে এগিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা। ভয়ঙ্কর চোখ মুখ। ধরে ফেলবার চেষ্টা করল রানাকে। সাঁৎ করে সরে গেল রানা, উঠে দাঁড়াল, এবং আচম্বিতে কনুই চালাল পেছন দিকে। সোলারপ্লেক্সাসের ওপর আচমকা গুঁতো খেয়ে ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল লোকটার মুখ, হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর।

আছড়ে-পাছড়ে আরও তিন ধাপ উঠল রানা, এমন সময় খপ করে ধরে ফেলল একজন রানার বাঁ হাতের কব্জি। তৃতীয় লোকটা। মাথা ভর্তি লাল চুল। নিচু হয়ে সিঁড়ির এপাশে চলে এসেছিল সে, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রেলিং-এর ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে।

হ্যাঁচকা টানে রেলিং-এর গায়ে ধাক্কা খেলো রানা। হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করল। আঙুল তো নয়, রানার মনে হলো লোহার

সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে ওর কব্জি। আশ্চর্য শক্তি লোকটার গায়ে, ছাড়ানো গেল না হাত।

সিঁড়ির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে বসে ব্যথায় কাতরাচ্ছে কনুইয়ের গুঁতো খাওয়া লোকটা, বন্য জন্তুর মত মাথা নাড়ছে এপাশ ওপাশ। এক লাফে ওকে ডিঙিয়ে উঠে এল প্রথম লোকটা। ঠোঁট সরে গেছে দাঁতের ওপর থেকে, দুই চোখে প্রতিহিংসার বিষ। প্রচণ্ড এক ঘুসি তুলল লোকটা রানার তলপেট লক্ষ্য করে। ওই এক ঘুসিই রানার জন্যে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু লাগাতে পারল না জায়গামত। আশ্চর্য ক্ষিপ্র বেগে শরীর বাঁকিয়ে সরে গেল রানা ছয় ইঞ্চি। দ্রাম করে পড়ল ঘুসিটা রেলিং-এর ওপর। কেঁপে উঠল সারা বাড়ি।

আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল লোকটার চোখ-মুখ। আরেকটা ঘুসি তুলল। ঠিক এমনি সময় বাতিস্তা এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়, একবার চোখ বুলিয়েই বুঝে নিল অবস্থাটা, মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল। সিঁড়ির তোয়াক্কা না রেখে ঝাঁপ দিল বাতিস্তা, পা আগে, মাথা পিছনে।

উড়ে এসে পড়ল বাতিস্তা লোকটার বুকের উপর, দু'পা নেমে গেল লোকটা, হোঁচট খেলো হামাগুড়ি দেয়া লোকটার গায়ে পা বেধে, হুড়মুড় করে পড়ল নিচে সানের ওপর, ওর বুকের ওপর পড়ল বাতিস্তা।

ডান হাতে রেলিং-এর ওপর ভর দিয়ে এক লাফে টপকাল রানা ওটা। ধপাস করে লাল-চুলো দৈত্যটার কাঁধে বসে পড়ল। দুই পায়ে যত জোরে সম্ভব দমাদম উল্টো লাথি মারতে শুরু করল সে লোকটার পেটে। রানাকে কাঁধে নিয়ে হুড়মুড় করে দেয়ালের গায়ে গুঁতো মারার চেষ্টা করল লোকটা বার কয়েক, সেদিকে সুবিধে করতে না পেরে রানার মাথাটা চুর করে দেয়ার জন্যে হঠাৎ সানের উপর পড়ল সে চিৎ হয়ে। রানার দুই ঊরু চেপে

ধরে আছে বুকের ওপর যেন সে নড়াচড়া করতে না পারে। পতনের অর্ধেকটা পথ চুপচাপ থাকল রানা, লোকটা যেই সম্পূর্ণভাবে ভারসাম্য হারাল ওমনি জোরে এক মোচড় দিল। ঘুরে যাচ্ছে লোকটার দেহটা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চট করে রানার ঊরু ছেড়ে দিয়ে নাক-মুখ ঠুকে যাওয়া থেকে বাঁচল লোকটা একহাতে মেঝে ধরে, অপর হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নামিয়ে দিল রানাকে কাঁধ থেকে। পর মুহূর্তে ক্যাঁক করে চেপে ধরল রানার কণ্ঠনালী। দম বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো রানার।

বিনা দ্বিধায় ডান হাতের তর্জনীটা ঠেসে ধরল রানা দৈত্যটার বাঁ চোখে। চিৎকার করে উঠল লোকটা। আরও জোরে খোঁচা দিল রানা। কণ্ঠনালীর ওপর থেকে খসে গেল বজ্র আঁটুনি। পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে লোকটা। দড়াম করে হাঁটুর একটা গুঁতো পড়ল ওর তলপেটে, পরমুহূর্তে কাঁধের পাশে পড়ল কারাতের এক তীব্র রদ্দা। ছিটকে গিয়ে রেলিং-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

বাতিস্তাকে বুকের ওপর নিয়ে সিঁড়ির ওপর থেকে নিচের মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়েই জ্ঞান হারিয়েছিল লোকটা প্রচণ্ড জোরে মাথাটা ঠুকে যাওয়ায়, কিন্তু কোনরকম ঝুঁকি নিল না বাতিস্তা, সটান উঠে দাঁড়িয়ে ঝপাং করে পড়ল আবার ওর বুকের ওপর দুই হাঁটু ভাঁজ করে। মড়াৎ করে শব্দ এল রানার কানে।

উঠে দাঁড়িয়ে রানার দিকে ঘুরতে যাচ্ছিল বাতিস্তা, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর ওড্ডি। রেলিং-এর গায়ে ছিটকে পড়া লোকটার কণ্ঠনালী টিপে ধরে এইদিকে চেয়েছিল রানা, পরিষ্কার দেখতে পেল বাতিস্তার খেলা। সেকেন্ড দশেক দমাদম ছোট ছোট ঘুসি মারল বাতিস্তা ওড্ডির নাকে-মুখে-বুকে-পেটে। প্রতিটা ঘুসি পড়ার সঙ্গে যেভাবে কেঁপে কেঁপে উঠল ওড্ডির শরীরটা, রানা বুঝল, ঘুসি তো নয়, আধমনী হাতুড়ির আঘাত পড়েছে ওর

ওপর। হঠাৎ একপাশে কাত হয়ে গেল বাতিস্তা, আঙুলগুলো সোজা রেখে দড়াম করে জুডো চপ মারল ওড্ডির নাভির ছয় আঙুল ওপরে। বাঁকা হয়ে গেল ওড্ডি, ব্যথায় বিকৃত ওর চোখমুখ। দড়াম করে আরেকটা জুডো চপ পড়ল ওড্ডির ঘাড়ের পেছনে। ঝুপ করে পড়ল মেঝের ওপর ওড্ডির জ্ঞানহীন দেহ।

কনুইয়ের গুঁতো খাওয়া লোকটা ছুরি বের করে ফেলেছে একটা। কণ্ঠনালী ছেড়ে দিয়ে এক লাফে রেলিং টপকাল রানা। বাতিস্তার বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে খপ করে ধরল রানা লোকটার কব্জি। বেকায়দা মত একটা চাপ পড়তেই ছুরিটা খসে গেল হাত থেকে। কিন্তু রানার কৌশলই ফিরিয়ে দিল লোকটা। বাম হাতের কনুই দিয়ে মারল রানার তলপেটে।

রানার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছিল বাতিস্তা, এমনি সময় করিডরের ডান পাশের একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন লোক। এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল বলে টের পায়নি কিছুই, ধাঁই-ধুঁই আওয়াজ বেড়ে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে কি হচ্ছে দেখার জন্যে। চোখের সামনে এই প্রলয়ঙ্কর অবস্থা দেখে মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল ওর সর্বাঙ্গের পেশী। চাপা একটা হুঙ্কার ছেড়েই লাফ দিল সামনের দিকে। একলাফে এসে পড়ল বেচারা বাতিস্তার খপ্পরে। গোটা চারেক ঘুসি খেয়ে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল লোকটা, বাতিস্তা পড়ল ওর ওপর।

সিঁড়ির ওপর লোকটা ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই সামলে নিল রানা। তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা, কিন্তু এখন এদিকে লক্ষ দিতে গেলে চলবে না। ডান হাতের জুডো হোল্ডটা ছাড়লেও চলবে না। সামনের দিকে ঠেলা দিয়ে লোকটার ভারসাম্য নষ্ট করে দিল রানা, তারপর দ্রুত দুই ধাপ নেমে এসে প্রাণপণ শক্তিতে থ্রো করল। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে শূন্যে উঠে গেল লোকটার শরীর। ঠিক এমনি সময় দড়াম করে খুলে গেল সামনের দরজা। ঝড়ের বেগে

ঘরে ঢুকল পাগলা ওস্তাদ।

উড়ন্ত লোকটার দিকে একনজর চেয়েই বাতিস্তার দিকে ফিরল ওস্তাদ। ঘাড় গুঁজে ঝুঁকে রয়েছে বাতিস্তা নবাগতের ওপর, হাত দুটো পিস্টনের মত কাজ করে চলেছে দ্রুত। ছটফট করছে লোকটা প্রচণ্ড হাতুড়ির ঘা খেয়ে, দুর্বল হয়ে আসছে ক্রমে।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিরতিশয় দুঃখিত হলো ওস্তাদ। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, খেলাটা ধাপুড়-ধুপুড়-ধাঁই হয়েছে। নিয়ম কানুন মানেনি কেউ। আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠল, 'আহ্-হা। কী করছ বাতিস্তা! ফাউল হচ্ছে তো।'

রানার ছুঁড়ে দেয়া লোকটা মাটিতে পড়েই উঠে দাঁড়াল আবার। দমাদম কয়েকটা ঘুসি মেরে বসল ওস্তাদের ভুঁড়ির ওপর। করুণ ভাবে মাথা নাড়ল ওস্তাদ।

'এভাবে মারতে হয় না, বাছা। নিজের গার্ডটা রাখতে হয় সব সময়। নইলে...'

প্রচণ্ড এক থাবড়া পড়ল লোকটার নাকের ওপর। ছিটকে গিয়ে গীয়ানের শরীরে হোঁচট খেয়ে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল লোকটা, সেখান থেকে ঝুপ করে পড়ল মাটিতে। দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল ওস্তাদ। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুরি তুলেছে গীয়ান গোক্ষুরের ফণার মত।

'ছুরির তো কথা ছিল না!' অবাক হয়ে গেল ওস্তাদ। 'নিরস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে ছুরি? কোন্ ইয়ারে পাস করেছ? তোমার কি আক্কেল বলতে কিছু নেই?'

ওস্তাদকে কটমট করে চাইতে দেখে একটু যেন থতমত খেয়ে গেল গীয়ান। সিঁড়ির ওপর থেকে লাফ দিল রানা। ঝট করে একটু সরে গিয়ে ছুরি চালাল গীয়ান। কব্জিটা ধরে ফেলল রানা ঠিক সময় মত, কিন্তু জুডো হোল্ডে ধরার আগেই ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিল গীয়ান ওর হাতটা। আঙুলগুলো সোজা রেখে সাঁই

করে মারল রানা কারাতে চপ নিচ থেকে ওপরে। নাকের নরম হাড়ের ওপর পড়ল আঘাতটা, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল নাক দিয়ে। পরমুহূর্তে কারাতের কোপ পড়ল ওর কনুই থেকে ইঞ্চি তিনেক নিচের নার্ভ সেন্টারে, খসে গেল ছুরি।

'কী যা-তা মার মারছ!' এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল ওস্তাদ রানাকে। 'তোমাদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। সবকিছু গুলিয়ে খেয়ে ফেলেছ! বাম পা-টা সামনে, ডান পা পিছনে রাখো, এই রকম। তারপর মারো নক আউট পাঞ্চ, এই রকম।'

করিডরের মাঝামাঝি গিয়ে লুটিয়ে পড়ল গীয়ান, আর উঠল না।

জ্ঞানহীন দেহটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বাতিস্তা, এগিয়ে এল এদিকে। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত।

'কোথাও জখম হননি তো, সিনর?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল বাতিস্তা।

নিজের গলায় হাত বোলাল রানা। কয়েকটা আঁচড় লেগেছে নখের, জ্বলছে। বলল, 'না। তোমার?'

'ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে পিঠে সামান্য ব্যথা লেগেছে। তেমন কিছুই নয়।' এপাশ ওপাশ চাইল। 'এবার কি করতে হবে, সিনর?'

জ্ঞানহীন দেহগুলো টেনে এনে সিঁড়ির নিচে জমা করতে শুরু করেছে ওস্তাদ, প্রত্যেকের জখম পরীক্ষা করে দেখছে এবং ঝেড়ে গাল দিয়ে চলেছে রানা ও বাতিস্তাকে অপদার্থ, অমানুষ, হৃদয়হীন, পাষণ্ড এবং ফাউল-প্লেয়ার বলে। ধমকে উঠল বাতিস্তার দিকে চেয়ে।

'হাঁ করে কি দেখছ? দড়ি নিয়ে এসো লম্বা দেখে।'

রানার ইঙ্গিতে করিডরের দুপাশের দুটো এবং শেষ মাথার ঘর খুঁজে নাইলনের একটা শক্ত লম্বা রশি নিয়ে এল সে।

রানা বুঝল, নিচ তলায় নেই অনিল। যদি থাকে, ওপরে আছে। দরজায় বল্টু লাগিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল। বাতিস্তার পিঠে মৃদু চাপড় দিল।

'ওয়েল-ডান্। তুমি ওস্তাদকে সাহায্য করো, আমি ওপরটা দেখছি। দরজায় টোকা পড়লে খুলো না।'

একেক বারে তিন ধাপ করে উঠতে শুরু করল রানা সিঁড়ি দিয়ে। দোতলাতেও তিনটে ঘর। প্রথম দুটো ঘরে কেউ নেই। তৃতীয় ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। বাইরে থেকে বল্টু লাগানো এ ঘরে।

বল্টুতে হাত দিতেই ঢিব ঢিব শুরু হয়ে গেল রানার বুকের ভিতর। এ বাড়িতে যদি থাকে অনিল তাহলে এই ঘরে আছে। যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে খুব কম সময়ের মধ্যেই ওকে খুঁজে বের করতে পেরেছে সে। কিন্তু...কি অবস্থায় দেখবে সে অনিলকে? জীবিত, না...

বল্টু খুলে ঠেলা দিল রানা দরজায়।

ছোট একটা ঘর। দুটো মদের বোতলের মাথায় বসানো মোমবাতি জ্বলছে। একটা ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছে একজন, একটা ফুলপ্যান্ট ছাড়া পরনে আর কিছুই নেই। ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে বাঁ কাঁধে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। ভৌতিক ছায়া ফেলছে মোমবাতির কম্পমান শিখা।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে মোমবাতিসুদ্ধ একটা বোতল তুলে নিল রানা হাতে। একবিন্দু নড়ল না শায়িত লোকটা।

মোমবাতি হাতে এগিয়ে গেল রানা বিছানার পাশে।

যদিও বহুদিন দেখা নেই, চিনতে একটুও কষ্ট হলো না রানার। সারা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ, নাক–ভুল নেই তাতে। শুয়ে আছে অনিল চ্যাটার্জী। চারিত্রিক দৃঢ়তার ছাপ রয়েছে ওর চেহারায়। পাশেই টেবিলের

ওপর একটা পাত্রে কিছু রক্ত মাখা তুলো, ব্যান্ডেজ, আর একটা পয়েন্ট থ্রী এইট ক্যালিবারের বুলেট।

নিঃসাড় পড়ে আছে অনিল। ফ্যাকাসে রক্তশূন্য চেহারা। চোখ বন্ধ। হঠাৎ রানার মনে হলো অনিলের মৃতদেহের দিকে চেয়ে রয়েছে সে। পরমুহূর্তে সামান্য একটু উঁচু হলো বুক, নাকের কাছে দুটো আঙুল নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করল রানা মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস।

পাল্স বিট দেখার জন্যে ওর বাম হাতটা তুলে নিয়েই চমকে উঠল রানা। অনেকগুলো খয়েরী পোড়া দাগ। সিগারেট ঠেসে ধরে নির্যাতন করা হয়েছে ওকে। এমন কিছু তথ্য আছে অনিলের কাছে যেটা সংগ্রহ করা শত্রুপক্ষের একান্তই দরকার। নির্যাতনের মুখে কি নতি স্বীকার করেছে অনিল?

অনিলের বুকের ওপর হাত রাখল রানা। নাড়া দিল মৃদুভাবে।

'অনিল। শুনতে পাচ্ছ?'

একটুও নড়ল না অনিল। বোঝা গেল না রানার কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা। বুকের সামান্য ওঠানামা দেখেই বুঝতে হচ্ছে যে বেঁচে আছে এখনও।

ঘরে ঢুকল ওস্তাদ।

'পেলে ওকে?'

'হ্যাঁ। জুলির মতই ওর ওপরও নির্যাতন চালানো হয়েছে।'

'মরে গেছে?' এগিয়ে এল ওস্তাদ, অনিলের অবস্থা দেখে উল্টো শিস দিল ঠোঁট গোল করে। চট করে পালস্ বিট দেখে নিল একবার।

'মরেনি, কিন্তু আধ-মরা। এখান থেকে বের করি কি করে ওকে?' এদিক ওদিক চাইল রানা। 'যে করে হোক গনডোলা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হবে ওকে।'

বাতিস্তা এসে ঢুকল ঘরে। লম্বা পা ফেলে এসে দাঁড়াল খাটের পাশে। বলল, ‘আমি আর ওস্তাদ মিলে ওকে ধরে...’

‘তোমাকে লাগবে না। আমি একাই পারব। তোশক দিয়ে মুড়ে নিলে সোজাই থাকবে। আমি নিচ্ছি, তোমরা দুজন গার্ড দাও আমাকে সামনে পিছনে। অবস্থা বেশি ভাল মনে হচ্ছে না।’

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইল রানা ওস্তাদের মুখের দিকে। উত্তর দিল বাতিস্তা।

‘আরও একজন ছিল এ বাড়িতে। পালিয়ে গেছে। নিচের একটা ঘরের ওপাশের দরজা ভিড়ানো ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল।’

তোশক দিয়ে মুড়ে কোলে তুলে নিল ওস্তাদ অনিলের অজ্ঞান দেহ। দ্রুত পায়ে নেমে এল ওরা নিচে।

সিঁড়ির নিচে শক্ত করে বেঁধে ফেলে রাখা ছ’জনের কারও হুঁশ নেই। একনজর দেখে নিয়ে সামনের দরজার বল্টু খুলে ফেলল রানা। সাবধানে মুখটা বের করল বাইরে।

এমনি সময়ে তীক্ষ্ণ শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল বাড়ির ভিতর কোথাও। একসাথে চমকে উঠল ওরা তিনজন। দরজা দিয়ে মুখ বের করে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত দেখল রানা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই রাস্তায়। একটি মাত্র বাতি জ্বলছে কাফের সাইন বোর্ডের মাথায়।

বেরিয়ে এল রানা বাইরে। পিছু পিছু ওস্তাদ। দরজাটা টেনে ভিড়িয়ে দিয়ে বাতিস্তা এল সর্বশেষে।

দ্রুতপায়ে ঢুকে পড়ল ওরা অন্ধকার গলিতে। মোড় নেয়ার আগে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল রানা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল পিছনের প্রত্যেকটা ফেলে আসা গলিমুখের দিকে।

সড়সড় করে গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল রানার। প্রত্যেকটা গলিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে চারজন করে লোক। সবার দৃষ্টি ওদের

দিকে ফেরানো। বিশ পঁচিশজন লোক একসাথে এগোচ্ছে এইদিকে।

‘পা চালান, ওস্তাদ,’ বলল রানা। ‘আমাদের ঠেকাবার চেষ্টা করা হবে এখন। সামনের দিকে ক’জন আছে আল্লাই মালুম।’

‘কত আর থাকবে, বড়জোর বিশ পঁচিশ জন আরও? এদের পিটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না? কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?’

এগারো

অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে তীক্ষ্ণ সুরে বেজে উঠল একটা হুইস্‌ল্।

প্রায় দৌড়ে এগিয়ে চলল ওরা।

মোটা মানুষ, তার ওপর অনিলের বোঝা, হাঁসফাঁস করছে ওস্তাদ। কিন্তু তারই মধ্যে বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে গেছে তার। বলল, ‘বেশ জমেছে, না?’

‘আপনি সোজা নিয়ে ওকে গনডোলায় তুলুন,’ বলল রানা। ‘আমরা দেখছি এদিকটা।’

কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল বাতিস্তা, থেমে দাঁড়াল রানা।

‘ওপাশের গলি দিয়ে আরও লোক আসছে, সিনর।’

রানাও শুনেছে পায়ের শব্দ। সমান্তরাল গলি দিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে কয়েকজন। পেছনে লোকগুলোও এগিয়ে আসছে দ্রুত।

‘ওস্তাদকে ঠেকাবার চেষ্টা করবে ওই লোকগুলো। চলো আমরা এগিয়ে থাকি।’

জোরে দৌড়াল দুজন। ওস্তাদের সামনে পেছনে গার্ড দিয়ে নিয়ে চলল ওরা। দুজনের হাতেই বেরিয়ে এসেছে দুখানা তীক্ষ্ণধার স্টিলেটো।

‘পিছনের ওরা কিন্তু আমাদের ওভারটেক করবার চেষ্টা করছে না, সিনর,’ বলল বাতিস্তা।

‘জানি,’ বলল রানা দৌড়াতে দৌড়াতে। ‘আমরা যাতে পিছু হটতে না পারি, তারই জন্যে এই ব্যবস্থা।’

গলিমুখে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল রানা। দুহাত তুলে পেছনের দুজনকে থামবার ইঙ্গিত করল। ত্রিশ গজ দূরে গনডোলার কাছে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারজন। অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

‘দাঁড়ান, ওস্তাদ!’ ফিসফিস করে বলল রানা। ‘এখন জলদি কাজ সারতে হবে। আর সবাই এসে পড়বার আগেই। আমি আর বাতিস্তা চার্জ করছি, আপনি আমাদের পিছু পিছু ছুটে গিয়ে উঠে পড়ুন গনডোলায়। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন না। উঠেই ছেড়ে দেবেন নৌকা। ওকে নিয়ে সোজা চলে যান আপনার বাসায়।’

ফোঁস ফোঁস হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ওস্তাদ। ছুরিটা গুঁজে রাখল রানা খাপে।

কনুই দিয়ে আস্তে একটা গুঁতো দিল রানা বাতিস্তার পেটে, তারপর বিদ্যুৎবেগে ছুটল সামনের দিকে, ঠিক যেন পিস্তল থেকে ছোঁড়া একটা গুলি। পরমুহূর্তেই ছুটল বাতিস্তা।

ওরা মাঝপথে পৌঁছতেই ওদের দেখতে পেল অপেক্ষমাণ চারজন। একটু হকচকিয়ে গেল এই অতর্কিত আক্রমণের সামনে। সবাই সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে প্রথম ধাক্কার সামনে থেকে। প্রত্যেকে চাইছে প্রথম চোট আর কারও ওপর দিয়ে যাক।

কিন্তু সামলে নিতেও দেরি হলো না ওদের। ছুরি বেরিয়ে এসেছে দুজনের হাতে। ঝিক করে উঠল আবছা আলোয়। ঠিক সময়মত বাঁ দিকে কাত হয়ে গেল রানা। নিচু হয়েই খপ করে

ধরল প্রথম লোকটার পা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে শূন্যে তুলে ফেলল পা-টা। জোরে একটা ধাক্কা দিতেই আর একজনকে নিয়ে পড়ল সে চিৎ হয়ে মাটিতে।

এদিকে বাতিস্তা ঝাঁপিয়ে পড়েছে দ্বিতীয় ছুরিধারীর ওপর। এত প্রবল বেগে এসে পড়ল যে ছুরি মারার আর সময় পেল না লোকটা, ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ভারসাম্য হারিয়ে। তার ওপর পড়ল বাতিস্তা। বন্যজন্তুর মত হুটোপুটি খাচ্ছে ওরা মাটিতে, চার হাত পায়ে মেরে চলেছে একে অপরকে, যে যেখানে পারে।

অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা। দ্রুত এগিয়ে আসছে এইদিকে।

বাতিস্তার পিঠে ছুরি বসাতে যাচ্ছিল একজন, লাফ দিল রানা। এক লাথিতে ছিটকে দূরে চলে গেল ছুরি, কিন্তু লোকটা জাবড়ে ধরল রানার কোমর, ঠেলে পেছনে নিয়ে এল কয়েক পা, গাছের শিকড়ে পা বেধে পড়ে গেল রানা, লোকটা পড়ল ওর বুকের ওপর।

প্রচণ্ড শক্তি লোকটার গায়ে। কারাতে, জুডো, সাভাতে, জুজুৎসু, আতে ওয়াযা, ইয়াওয়ারা, আইকিডো–যত যা আছে সব জ্ঞান প্রয়োগ করে বহু কষ্টে একটু কাবু করে আনল রানা লোকটাকে, উঠে বসল ওর বুকের ওপর। ঠিক এমনি সময়ে আর একজন পেছন থেকে চেপে ধরল রানার গলা। হাঁটুটা ঠেসে ধরে আছে সে রানার শিরদাঁড়ার ওপর। সুযোগ বুঝে নিচের লোকটা ছুটিয়ে নিল একটা হাত, এবং ধাঁই করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানার নাকের ওপর। বোঁ করে উঠল রানার মাথা। ধুপধাপ পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সে, অনেক লোক এগিয়ে আসার, অস্পষ্ট হয়ে গেল শব্দটা।

গলা থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল রানা, পেছন দিকে

কনুই চালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হলো না কিছুই। ক্রমে আরও চেপে বসে যাচ্ছে আঙুলগুলো গলার মাংসে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে রানার, ভোঁ-ভোঁ করছে কান, মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে পালস-বিট। আরেকটা ঘুসি পড়ল ওর চোয়ালের ওপর। প্রাণপণ শক্তিতে ওপর দিকে ঠেলা দিল রানা, কাত হয়ে পড়ল বাঁ পাশে। পিঠের ওপর চেপে বসা লোকটাও পড়ল ওর সঙ্গে। পড়েই এক গড়ান দিল রানা, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল দুজন একসঙ্গে। বেশ গভীর পানি।

পানিতে পড়েই রানার গলা থেকে হাত ছুটে গেল লোকটার। ওপরে ভেসে উঠল রানা। ওর কাছাকাছিই ভেসে উঠল লোকটা, মুখ দিয়ে অনর্গল বেরোচ্ছে ইটালিয়ান গালি।

ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে এসেই বোধশক্তি ফিরে এসেছে রানার। বড় করে একটা দম নিয়েই ডুব দিল সে। খপ করে লোকটার কোট ধরে টেনে নামিয়ে আনল নিচে। দুই পা দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরেছে সে লোকটার, অসহায় ভাবে ধরা পড়েছে লোকটা রানার হেড-লকে। ধীরে ধীরে রানার দুই হাত চলে এল লোকটার কণ্ঠনালীর উপর। আধমিনিটের মধ্যে গোটা কয়েক ঝাঁকুনি খেল লোকটার সর্বশরীর, তারপর জ্ঞান হারিয়ে স্থির হয়ে গেল। লোকটার পাছায় জোরে এক লাথি মেরে ওকে তীরের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে ভুশ করে ভেসে উঠল রানা পানির ওপর।

'আপনি নাকি, সিনর মাসুদ রানা?' বাতিস্তার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ওপর থেকে চুল সরাল রানা। ব্রেস্টস্ট্রোক দিয়ে চলে এল বাতিস্তার পাশে।

'ঠিক সময় মতই পানিতে পড়েছিলেন,' বলল বাতিস্তা। 'আরও পনেরো বিশজন পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়। আপনাকে পানিতে পড়তে দেখে আমিও সোজা ডাইভ দিয়েছি খালে।'

'ওরা কোথায়?' এদিক ওদিক চেয়ে গনডোলাটা খুঁজল রানা।

‘খালের দুই পারে। অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।’

‘আর ওস্তাদ?’

‘নিরাপদে চলে গেছে গনডোলা নিয়ে। গনডোলায় ছিল ওদের একজন। ওকে মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে পারে ফেলে ছেড়ে দিয়েছে নৌকা। ও-ই তো আপনার গলা টিপে ধরেছিল।’

‘আমিও ওর গলা টিপে দিয়েছি পানির নিচে। ঠিক আছে, এগোও এবার। শব্দ করো না। খুব সম্ভব দেখতে পাবে না ওরা আমাদের।’

এগোল ওরা, কিন্তু কিছুদূর এগিয়েই ভুল ভাঙল রানার। পরিষ্কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে খালের দুপারে দুটো দল। খালের অন্ধকারতম জায়গায় থেমে দাঁড়াল ওরা কিছুক্ষণ, থেমে গেল পায়ের শব্দ।

বেশ কিছুটা দূরে অস্পষ্ট একটা ছপাৎ শব্দ শুনে প্রমাদ গুণল রানা।

‘বাতিস্তা। একটা গনডোলা আসছে এইদিকে। কাছাকাছি এলেই ডুব দেবে। যদি মাথার ওপর ছপাৎ আওয়াজ পাও, বুঝবে আমাদের ধরতে এসেছে ওটা। কিংবা মারতে এসেছে। সাবধান!’

‘ওস্তাদও হতে পারে, সিনর। হয়তো...’

কথাটা শেষ করবার আগেই বড় একটা কালো গনডোলার ছায়া দেখা গেল। বাতি নেই। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রায় ওদের ঘাড়ে এসে পড়বার উপক্রম করল গনডোলাটা।

‘ডুব দাও।’ প্রায় ধমকের সুরে বলল রানা।

ডুব দিল রানা। কয়েক মুহূর্ত আগে যেখানটায় ওর মাথা ছিল, ঠিক সেই জায়গাটায় চড়াৎ করে জোরে একটা আওয়াজ হলো। মনে মনে হাসল রানা। ঠিক জায়গাতেই মেরেছে গনডোলিয়ার, শুধু সময়ের একটু এদিক আর ওদিক।

চট করে ভেসে উঠল রানা। কাছাকাছিই ভেসে উঠল বাতিস্তা। একই সঙ্গে চোখ গেল দুজনের গনডোলার দিকে।

একটু এগিয়েই থেমে দাঁড়িয়েছে গনডোলা। আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে চালককে। ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে ঘোরাচ্ছে নৌকাটা।

'গনডোলাটা দখল করে নেয়া যাক, কি বলো?' চাপা কণ্ঠে বলল রানা। 'দুজন দুপাশে। ওর বৈঠা থেকে সাবধান।'

'আমি ওর মনোযোগ আকর্ষণ করব, সিনর। আপনি ওর পা ধরে মারবেন খিঁচে টান।'

'ঠিক আছে। এই যে আসছে। ডুব দাও।'

ডুব দিয়ে সরে গেল দুজন দুপাশে।

পানি থেকে বুক পর্যন্ত উঁচু করে ফেলল বাতিস্তা, হাত নেড়ে ইশারা করল গনডোলিয়ারকে।

দুই হাতে বৈঠাটা মাথার ওপর তুলল মাঝি। সামনে এগিয়ে এল রানা, চট করে গলুই ধরে উঠে পড়ল উপরে, থাবা চালাল পায়ের কব্জি লক্ষ্য করে। গনডোলিয়ারের ফুলপ্যান্ট বাধল হাতে। সেটা খামচে ধরে আবার লাফ দিল রানা পেছন দিকে।

একখানা কলজে কাঁপানো আর্তনাদ দিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল লোকটা বৈঠা ছেড়ে।

ততক্ষণে দ্রুত এগিয়ে এসেছে বাতিস্তা। দমাদম দুটো কিল বসিয়ে দিল গনডোলিয়ারের নাক বরাবর। আর টুঁ শব্দ না করে একরাশ ভুড়ভুড়ি ছেড়ে তলিয়ে গেল লোকটা। সাঁতরে গিয়ে ভাসমান বৈঠাটা নিয়ে এল রানা।

মাঝিবিহীন গনডোলা ধীরে ধীরে চলেছে পারের দিকে।

বৈঠাটা পাটাতনের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে গলুই বেয়ে উঠে পড়ল রানা। বাতিস্তাও উঠে এল। দশ সেকেন্ডে সোজা হয়ে গেল গনডোলা পাকা মাঝি পেয়ে। অন্ধকার ভেদ করে ছুটল ওরা সামনের দিকে। পাঁচ মিনিট পর থেমে গেল পায়ের শব্দ।

ছোট খাল ছেড়ে বড় খালে পড়েছে ওরা। আর অনুসরণ করবার উপায় নেই।

তীরবেগে ছুটে চলেছে গনডোলা।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)